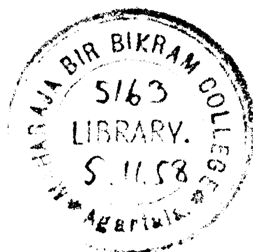
রাজা রামমোহন

শ্রীতাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)



রীডার্স কর্ণার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩
এক টাকা বার আনা

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীলক্ষ্মী দাস

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

ভূমিকা

রাজর্ষি রামমোহন রায়ের এই জীবনালেখ্যখানি পড়িলাম। লেখকের কৃতিত্ব দেখিয়া আমি পরম আহ্লাদিত; রামমোহনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক দরদ গ্রন্থখানিকে রসাঢ্য করিয়াছে। বাঙ্‌লা দেশের এই বীর রাজার ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং তেজস্বিতার নিকট সে যুগের গর্বিত শাসকদিগকেও মাথা নত করিতে হইত। রামমোহন সম্বন্ধে জনপ্রিয় কাহিনীগুলি এই গ্রন্থে সুভাবিত হইয়াছে। রাজনীতি এবং ধর্ম-সম্বন্ধে রাজার অভিমত সহজ-বোধ্য ভাষায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্‌লার নবযুগের স্রষ্টা রামমোহনের জীবন-কথার আলোচনা যত অধিক হয় ততই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর।

বাণী-তপস্যায় গ্রন্থকার জয়শ্রীযুক্ত হইবেন।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

এই বইখানির একটু ইতিহাস আছে। আমি লণ্ডন আসার অল্প কিছুদিন পূর্বে হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকালোবরণ ঘোষ মশায় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "নব্যভারতের" একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য রামমোহন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন। আমি ছোট্ট করেই একটি প্রবন্ধ লিখব ঠিক করি, এবং সে-জন্য পড়াশোনা করতে করতে শ্রদ্ধেয় বিমানবিহারী মজুমদার মশায়ের History of Political Thought, from Rammohun to Dayananda (1821-84) বইখানি পড়ি। ভারতবর্ষের নবজাগৃতির পিতা এই বিরাট পুরুষের প্রতি আমার আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, এবং অল্প সময়ের মধ্যে আমি রামমোহনের নিজের সমস্ত লেখা ও তাঁর সম্বন্ধে অন্য লেখকদের লেখা প্রায় সব বই প'ড়ে ফেলি। এর ফলে ছোট লেখা আর হ'য়ে উঠলো না, লেখা হ'ল এই পুস্তিকাখানি।

এই সুযোগে প্রথমেই প্রণাম জানাই কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। এই বই-এর পাণ্ডুলিপিখানি তাঁকে আগাগোড়া প'ড়ে শুনিয়েছিলাম এবং তিনি খুশী হ'য়ে নিজের থেকে এর জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। আমি বিদেশে চ'লে আসার পরও কতবার তিনি বইখানি কবে প্রকাশিত হবে জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন। দুঃখ রয়ে গেলো বইখানি তাঁকে দেখাতে পারলাম না।

এ-ছাড়া বইখানি লিখতে যাঁরা আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযামিনীকান্ত সোম মহাশয়, অগ্রজ শ্রীতরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধুবর শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও শ্রীঅরুণপ্রকাশ নাথ, এবং মাতৃষ্বসা শ্রীমতী বিজয়া দেবীর নাম করব। প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র বইখানির প্রকাশ ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

আমার লণ্ডন-প্রবাসে নিজের সময় কাটাতে যাঁদের অনেক সময় নষ্ট করেছি, এবং সময়ে-অসময়ে যাঁদের বিরক্ত ক'রে প্রতিদানে পেয়েছি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা, সেই ভবেনকাকা, তুলিকাকাকীমা, মামীমা, খুকু, আর তিন বছরের 'Big Girl' গাগ্লুর নাম এই বইখানির সঙ্গে জড়িয়ে থাক। সেই সঙ্গে জড়িয়ে থাক আমার লণ্ডনের স্মৃতি-বিজড়িত ডাঃ শশধর চক্রবর্তী, শ্রীঅরুণচন্দ্র রায়, আর শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবীর নাম, বিলেতের মাটীতে যাঁদের আন্তরিকতায় ভরা দিশী আতিথেয়তা কখনও ভোলবার নয়।

লণ্ডন
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

লেখক

বইখানি লিখতে যে-সব বই থেকে সাহায্য পেয়েছি—

The English Works of Raja Rammohun Roy Ed. by K. Nag and D. Burman, Cal. 1945-8.

Selections from Official Letters and Documents relating to the life of Raja Rammohun Roy Ed. by R. Chandra and J. K. Majumdar, Cal. 1938.

The Father of Modern India : Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations, 1933 Ed. by S. C. Chakrabarti, Cal. 1935.

Rammohun Roy : The man and his work Ed. by Amal Home, Cal. 1933.

History of Political Thought from Rammohun to Dayananda (1821-84) by Biman Behari Majumdar, Cal. 1934.

Rammohun Roy and America by A. Moore, Cal. 1942.

Raja Rammohun Roy by N. Macnicol, Madras, 1919.

Rammohun Roy and Hinduism by S. Haldar, Ranchi, 1920.

Raja Rammohun Roy by N. C. Ganguly, Cal. 1934.

Raja Rammohun Roy : A study of his life, works and thoughts, Cal. 1933.

রামমোহন রায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৪২-৪৩।

রাজা রামমোহন

॥ এক ॥

সাত সাতটা ছেলের বাপ ব্রজবিনোদ রায়। সম্ভ্রান্ত লোক। পাঁচজনে মানে গণে। মুরশিদাবাদে নবাব-সরকারে ভাল কাজ করতেন। কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে উপরওলাদের সঙ্গে মতান্তর হ'ল ব্রজ-বিনোদের। মতান্তর থেকে মনান্তর। নানান রকম অন্যায় ব্যবহার হ'তে লাগল তাঁর ওপর। ব্রজবিনোদ দেখলেন চাক্‌রি কর্‌তে গেলে আত্মসম্ভ্রম থাকে না, থাকে না আত্মসম্মান। তাই ছেড়ে দিলেন সে চাক্‌রি। মুক্ত করলেন নিজেকে দাসত্বশৃঙ্খল থেকে।···

বসতি স্থাপন করলেন রাধানগরে। হুগলি জেলার খানাকুল কৃষ্ণ-নগরের কাছেই এই গ্রাম। পূব দিক দিয়ে কুল কুল ক'রে ব'য়ে চ'লেছেন দারুকেশ্বর। তাঁর স্নেহাঞ্চলছায়ায় গ্রামখানি শস্যশ্যামল। এলেন ব্রজবিনোদ এই গ্রামে। বৈষ্ণবশিরোমণি অভিরামস্বামীর পূত সাধনক্ষেত্রের সন্নিকটে। পূজো-আর্চায় মন দিলেন। শরণ নিলেন গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দর।

পরমবৈষ্ণব ব্রজবিনোদ। বয়স হ'য়েছে। বুঝতে পারলেন সময় সমাগত। শুনতে পেলেন ও-পারের ডাক। একান্ত ইচ্ছা মনে মনে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। ডাকলেন ছেলেদের। বললেন সে কথা। ছেলেদের কাঁধে চেপে চ'লে এলেন গঙ্গাতীরে। মৃত্যুপথযাত্রী শুয়ে আছেন গঙ্গার ধারে। গঙ্গার প্রবাহে দেখতে পাচ্ছেন বৈতরণীর প্রবাহ, তার জলোচ্ছ্বাস দেখে ভ্রম হ'চ্ছে বৈতরণীর জলোচ্ছ্বাস ব'লে।

দেখা করতে এসেছে শ্যাম ভট্টচায। এসেছে ভিক্ষার্থী হ'য়ে। শ্রীরামপুরের কাছে চাতরায় থাকে। সম্ভ্রান্ত বংশ, দেশগুরু ব'লে সকলে

খাতির করে। এক খাসা চাল চালল শ্যাম ভট্টচায। ব্রজবিনোদকে ধ'রে বসল—তা'র একটি প্রার্থনা পূরণ করতেই হবে। রাজী হ'লেন ব্রজবিনোদ। যাবার বেলা নিরাশ করেন কি ক'রে প্রার্থীকে? কিন্তু কি চায় ভট্টচায? কি তার প্রার্থনা? শ্যাম ভট্টচায অনুরোধ জানালেন তাঁর একটি কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে হবে। কী সর্বনাশ! পরমবৈষ্ণবের ঘরে আসবে শাক্ত আর ভঙ্গ কুলীনের মেয়ে? এও কি কখনো হয়? কিন্তু না হ'য়েই বা উপায় কি? মা ভাগীরথীর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছেন ব্রজবিনোদ। এখন ত' আর অস্বীকার করা যায় না!

…মনে পড়ল রাজা যযাতির কথা। রাজগুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে রাজা জরাগ্রস্ত। অনেক অনুনয় বিনয় করলেন যযাতি তাঁকে শাপান্ত করবার জন্য। কিন্তু যে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তা' ত' আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তোষামোদে অবশেষে প্রসন্ন হ'লেন শুক্রদেব। ব'ললেন, তোমার পাঁচ ছেলের মধ্যে কেউ যদি তোমার জরা গ্রহণ করে, তবে তা'র যৌবনের বিনিময়ে তুমি যৌবন লাভ করতে পার। ফিরে এলেন রাজা প্রাসাদে। মনে সংশয়, কেউ কি রাজী হবে তা'র যৌবন পিতাকে দিয়ে সহস্র বৎসর জরাভোগ করতে? ডাকলেন সব ছেলেকে। একে একে জিজ্ঞেস করলেন সকলকে তা'রা পিতার এই দুর্বহ ভার বহন করতে রাজী কি না। প্রথম চার জন সাফ জবাব দিয়ে দিল। ব'লে দিল তা'রা, এ অসম্ভব, কিছুতেই হ'তে পারে না। ভীত-কম্পিত হৃদয়ে ডেকে পাঠালেন রাজা কনিষ্ঠ ছেলে পুরুকে। এক কথায় রাজী হ'য়ে গেল পুরু। বললে, ভাল-মন্দ, সুখ-সুবিধা, জরা-যৌবন—কিছুই আমি বুঝি না। জানি না অন্য কিছুই। আমি জানি পিতৃ আজ্ঞা। পালন ক'রব তা' জীবন দিয়েও। আর পিতাকে প্রসন্ন করতে সামান্য সহস্র বৎসর পারব না তাঁর জরা নিজ শরীরে গ্রহণ করতে? বেঁচে গেলেন রাজা। পুরুকে জরাভার দিয়ে নিজে যৌবনলাভ করলেন।

ব্রজবিনোদও ডেকে পাঠালেন সাত ছেলেকে। একে একে সকলকেই তিনি অনুরোধ করলেন পিতৃসত্য পালন করতে। শ্যাম ভট্টচাযের মেয়েকে বিয়ে করতে। কিন্তু রাজী হ'ল না কেউ। কেবল পঞ্চমপুত্র রামকান্ত খুসী মনে রাজী হ'য়ে গেলেন। শ্যাম ভট্টচাযের মেয়ে তারিনীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রামকান্তর। এইভাবেই হ'ল এক পরমবৈষ্ণব বংশের সঙ্গে আর এক নিষ্ঠাবান শাক্ত বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ। বিয়ের পর প্রথমে একটি মেয়ে হ'ল, তারপর একটি ছেলে। শেষ ছেলেটি হ'ল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে। নাম রাখলেন রামমোহন। পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ রামকান্ত লাভ করলেন রামমোহনের মত ছেলে, পরে যে ছেলে রাজো-পাধিতে ভূষিত হ'ল, সম্মান পেল রাজাধিরাজের।

॥ দুই ॥

টুকটুকে বউ এসেছে বাড়ীতে। ঢলঢল মুখখানি, ফুলের মত সুন্দর, ফুলের মত পবিত্র। শ্বাশুড়ী ডাকেন 'ফুলবউমা' ব'লে। আর সকলে বলে "ফুলঠাকরুণ।" বাপের বাড়ীতে শক্তির উপাসনা ক'রে এসেছেন। শ্বশুরবাড়ীতে এসে দীক্ষা নিলেন বিষ্ণুমন্ত্রে।

বাঙালীর ঘরে বারো মাসে তের পার্ব্বণ। এমনি এক উৎসবে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন শ্যাম ভট্‌চায। সঙ্গে এসেছে কোলের ছেলে রামমোহন। ইষ্টদেবতার পূজো হ'য়ে গেছে। শিশু দৌহিত্রের মাথায় পূজোর বেলপাতা ঠেকিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন শ্যাম ভট্‌চায। বালক তখন সবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্যনূতন জিনিষের সঙ্গে পরিচিত হ'চ্ছে। যা' পাচ্ছে তাই মুখে দিয়ে, চিবিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করছে। দু' হাত দিয়ে বালক নিতে চাইল সেই বেলপাতা, শ্যাম ভট্‌চায দিলেন তা'র হাতে। কি অপূর্ব্ব জিনিষই না দিলেন মাতামহ! বালক তা' খানিকক্ষণ ধ'রে নিরীক্ষণ করল, তারপর পরম আহ্লাদে মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ ক'রে দিল। এমন সময়ে মা এসে পড়লেন। দীক্ষিতা ফুলঠাকুরুণ। সহ্য করতে পারলেন না। রেগে গেলেন খুব। ছেলের মুখ থেকে বেলপাতা ফেলে দিলেন জল দিয়ে ভাল ক'রে ধুয়ে দিলেন তার মুখ। তারপর গেলেন বাবার কাছে। গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। রাগে ফুলে উঠলেন শ্যাম ভট্‌চায। এতদূর স্পর্দ্ধা! ইষ্টদেবতার পূজোর বেলপাতা ফেলে দিল মেয়ে! এতই অহঙ্কার! শাপ দিলেন তিনি মেয়েকে, 'এ ছেলেকে নিয়ে তুই কখনও সুখী হ'বি না। এ বড় হ'য়ে বিধর্মী হবে'। নিষ্ঠাবান পিতা! তাঁর মুখের কথা যে ফলবেই! ভয় পেয়ে গেলেন ফুলঠাকরুণ। কাতর হ'য়ে পড়লেন। বাবার পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন। ফিরিয়ে নিন তিনি এ শাপ, বাঁচান তাকে এই অভিসম্পাত থেকে। কিন্তু তা' কি হয়? হাতের বাণ একবার হাত থেকে বেরিয়ে গেলে আর কি তা' ফিরিয়ে আনা যায়? মেয়ের

কাঁদাকাটিতে শান্ত হ'লেন ব্রাহ্মণ। বললেন, যা' ব'লে ফেলেছি তা' হবেই। তবে এই তোকে ব'লে দিলাম যে তোর ছেলে মস্ত বড় লোক হবে, হবে সে রাজপূজ্য। তবু বাঁচোয়া। একটু ভরসা পেলেন ফুলঠাকরুণ। শ্বশুরবাড়ী এসে রামকান্তকে বললেন এ কথা। রামকান্তও ভয় পেয়ে গেলেন। কী সর্ব্বনাশ! বিধর্মী হবে ছেলে? রায় বংশের ছেলে হিঁদুয়ানী মানবে না? থাকবে না হিন্দুধর্মের আওতায়? ঠিক আছে! বিধর্মী করছি তোমায়, দাঁড়াও! স্বামী-স্ত্রীতে মিলে উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন ছেলেকে ধর্মশিক্ষা দিতে। মনেপ্রাণে খাঁটী হিন্দু ক'রে তুলতেই হবে রামমোহনকে।…

॥ তিন ॥

নিতান্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ফুলঠাকরুণ, দেশপ্রচলিত ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস। জীবনের বাতি নিবু নিবু হ'য়ে আসছে। চিন্তা হ'য়েছে পরকালের। খুঁজছেন মুক্তি। সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ভয় জাগছে মনে আবার যদি জন্ম নিতে হয়! আবার যদি জড়াতে হয় এই সংসার জালে! শুনেছেন তিনি জগন্নাথ দর্শন করলে মুক্তি পাওয়া যায়। রথারূঢ় বামনদেবকে দেখতে পেলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তাই মন হ'য়েছে পুরী যাবেন। নেবেন জগন্নাথের আশ্রয়। জগতের নাথ তিনি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়দাতা, বিপদত্রাতা, দুঃখহন্তা। তাঁকে কি বিমুখ করবেন দেবতা?

সংসারের অবস্থা ভাল। সকলে বললেন, সঙ্গে দাসদাসী নাও, আহার আহার্য্য নাও, সব ব্যবস্থা ক'রে নাও যাতে পথে অসুবিধা না হয়। আরামের ত্রুটি যেন না হয় এতটুকু। অভাব যখন নেই, তখন যাবে কেন অসুবিধা ভোগ করতে? কিন্তু কিচ্ছু নিতে রাজী হ'লেন না ফুলঠাকরুণ। রাজী হ'লেন না কিছুতেই। যাবেন দেবদর্শনে, সুখ-সুবিধার কথা কি কিছু চিন্তা করতে আছে? ক'দিনের এই দেহ? তার জন্য আবার এত মায়া? আর কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়? দুঃখের মধ্যে দিয়েই তো পাওয়া যায় অন্তরদেবতাকে। ঝড়ের রাতেই তো তাঁর অভিসার। তাই পায়ে হেঁটেই চললেন ফুলঠাকরুণ। চললেন অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত, সঙ্গে কিচ্ছু নিতে দিলেন না। অবশেষে হাজির হ'লেন গিয়ে শ্রীক্ষেত্রে। দর্শন করলেন দেবতাকে, মন ভুলে গেল, ভুলে গেলেন তিনি সংসারের কথা, বাসনা হ'ল কিছুদিন ঠাকুরের সেবা করবেন। মান-অভিমান চ'লে গেল। চ'লে গেল অর্থহীন অহং-জ্ঞান। পুরো একটা বছর কাটিয়ে দিলেন তিনি নীলাচলে। এই সময়ে রোজ তিনি সামান্য পরিচারিকার মত জগন্নাথদেবের মন্দির পরিষ্কার করতেন। ঠাকুরের কৃপায় চ'লে গেল জাত্যাভিমান। ভুলে গেলেন বংশমর্যাদা।

এই মায়ের কাছে ধর্মশিক্ষা রামমোহনের। খুব অল্প বয়স থেকেই মায়ের মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনেছে রামমোহন। শুনেছে ধর্মের নানান অলৌকিক কাহিনী। কল্পনাপ্রবণ বালক মুগ্ধ হ'য়ে শুনেছে সে-সব কাহিনী, আর ভক্তিশ্রদ্ধায় মন ভ'রে উঠেছে। হিন্দুধর্মের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা তার, অগাধ ভক্তি গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দর ওপর। কতদিন দুপুরবেলা চ'লে যেত একা গোপীনাথের মন্দিরে। ঠাকুরের ওপর অভিমান ক'রে ব'সে ব'সে কাঁদত সে। কেন ঠাকুর তাকে দেখা দেবেন না? কি তার অপরাধ? সে তো শুনেছে, যেই আকুল হ'য়ে ডেকেছে তাঁকে, তিনি তাকেই দেখা দিয়েছেন, পূর্ণ করেছেন তার মনস্কাম। তবে তা'র আকুলতা কি ঠিকমত হয় নি? ঠিকভাবে ডাকতে পারে নি ভগবানকে? চোখের জলে বুক ভেসে যেত রামমোহনের।

বাড়ীতে মানভঞ্জন পালা যাত্রা হয়, ছেলেমেয়েদের কি আনন্দ তা'তে! কত রকম সাজ গোজ ক'রে, কি রকম অদ্ভুত এক ধরনের সুরে কথা বলে যাত্রার দলের লোকেরা! সব চেয়ে মজা লাগে যে জায়গাটায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পায়ে ধ'রে কাঁদেন। কেমন ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে লোকটা—যে লোকটা কৃষ্ণ সাজে। শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া ধুলোয় লুটোপুটি খায়। খুব উপভোগ করে সকলে। রামমোহন কিন্তু কেঁদেই আকুল। তার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের এই দুর্দশা সে সহ্য করতে পারে না। তা'র কাঁদাকাটির চোটে বাড়ী থেকে মানভঞ্জন পালা যাত্রা হওয়াই উঠে গেল।···

চোদ্দ বছরের ছেলে রামমোহন। খেয়াল ধরেছে সন্ন্যাসী হব। বেশ জীবন ওদের। জটাজুট মাথায়, হাতে কমণ্ডলু, ত্রিশূল, ভস্মমণ্ডিত দেহ, জিনিষপত্রের বড় একটা বালাই নেই, নেই বাহ্যিক আড়ম্বরের সমারোহ। ছোট একটু পুঁটলির মধ্যে ঘর-সংসারের সব সাজ-সরঞ্জাম। বেড়াও, যেখানে-সেখানে চলে যাও যেদিকে দু'চোখ যায়। নদীর কাজ যেমন ব'য়ে যাওয়া, সাধুর ধর্মও তো কেবল ঘুরে বেড়ানো, জায়গাবদল

করা। ভ্রমণ ক'রে বেড়াও, হও পরিব্রাজক, ঘরের মায়া ছাড়ো, ছাড়ো ওই বদ্ধ গণ্ডীর আবেষ্টনী। তবেই অনুভব করতে পারবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমার অন্তরের অন্তস্তলে। ঘর বা'র এক ক'রে দিতে হবে, ভুলতে হবে আপন-পর ভেদ, তাই সন্ন্যাসী হ'তে চায় রামমোহন। মা শুনলেন সে সঙ্কল্পের কথা, ছুটে এলেন ছেলের কাছে। কাতর হ'য়ে পড়লেন তিনি, কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। মায়ের চোখের জলে ছেলের মন গলল। নিবৃত্ত হলেন রামমোহন।

॥ চার ॥

গুরুমশায়ের পাঠশালায় রামকান্ত ভর্তি করে দিলেন ছেলেকে। পাত্‌তাড়ি বগলে ক'রে, দোলাই গায়ে দিয়ে নতুন পড়ুয়া হাজির হয় পাঠশালায়। পড়াশোনায় এই ছোট্ট ছেলেটির অদ্ভুত নিষ্ঠা! অসাধারণ তার মেধা, বুদ্ধি! মুগ্ধ হ'য়ে যান গুরুমশাই।

পাঠশালায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে বাবার কাছে পারসী শেখে রামমোহন। কিন্তু না, তেমন সুবিধে হ'চ্ছে না বাড়ীতে। নবাব সরকারে ভাল চাক্‌রি করতে হ'লে পারসী ও আরবী খুব ভাল ক'রে শেখা চাই। তাই ন'বছর বয়সে রামকান্ত তাকে পাটনায় পাঠিয়ে দিলেন। মেধাবী ছেলে। তু' তিন বছরের মধ্যেই খুব ভাল ক'রে শিখে ফেলল এই তু'টি ভাষা। মূল আরবীতে পড়ে ফেলল ইউক্লিড ও আরিষ্টটলের বই। এতে সুবিধেও হ'ল অনেক। ন্যায়শাস্ত্রে তার অসাধারণ অধিকার জন্মাল, তর্কশক্তিও বৃদ্ধি পেল আশাতীত রকমে। মুসলমানরা তার নাম দিল "জবর্‌দস্ত্‌" মৌলবী।

ঠিক হ'য়েছে। পারসী ও আরবী ত শেখা হ'য়ে গেছে। চাক্‌রির ত আর চিন্তা নেই, ভাবনা নেই পেটের। এবার তোমার নিজের ধর্মটা একবার ভাল ক'রে জানো। সংস্কৃত না শিখলে ধর্মের বুঝবে কি? কুছ্‌ পরোয়া নেই। চলে যাও কাশী। হিন্দুধর্মের, সংস্কৃত শাস্ত্রের পীঠস্থান ত' ঐ বারাণসী। বারো বছর বয়সে রামমোহন চ'লে গেলেন কাশী। এখানেও বেশী সময় লাগল না। আর্যশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন রামমোহন।

কিন্তু এই হ'ল কাল। একে ত' প্রথমে মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ তার মনে বেশ একটা ছাপ ফেলেছিল। তারপর এখন সঞ্চিত হ'ল প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান। বাড়ী ফিরে এসে সব সময়েই ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করে। নানান প্রশ্ন জাগে মনের ভিতর। হিন্দু-ধর্মের নামে যে সব আচার অনুষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে সমাজে তা'র প্রতি

সন্দেহ জাগে। মন বিদ্রোহ করে ওঠে তা'র বিরুদ্ধে। শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন বাবার সঙ্গে। বলেন, এ সব সংশয়ের কথা। রামকান্ত খুব সন্তুষ্ট হন না তা'তে। ছেলের মতিগতি দেখে বিরক্ত হন। আশঙ্কা জাগে, শ্যাম ভটচাযের অভিশাপ সফল হ'তে চলল না তো? শেষ-কালে কি সত্যি সত্যিই ছেলেটা বিধর্মী হবে? সাধারণতঃ ধৈর্য ধ'রে শোনেন ছেলের কথাবার্তা। মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'য়ে তিরস্কারও করেন। এই সময়ে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার নামে এক মহাপণ্ডিত রাধানগরে আসেন। তাঁর কাছ থেকে রামমোহন মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র আর কুলার্ণব তন্ত্রের একেশ্বরবাদ শিখে একেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন।

ষোল বছরে পা দিয়েছে রামমোহন, যে বয়সে এখনকার ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে, লেখে 'মিসিসিপি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নদী' সেই বয়সে লিখে ফেললেন এক বই। লিখলেন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ক'রে। বাঙ্গলা হরফ তখনও হয়নি, তাই ছাপবার ব্যবস্থা হয়নি। তবু এ কথা কানে গেল রামকান্তর। অত্যন্ত বিরক্ত হ'লেন তিনি। ছেলেকে ডেকে আচ্ছা ক'রে ধমকে দিলেন। ব'লে দিলেন, বাড়ীতে যদি থাকতে চাও, তবে থাকতে হবে আমার আওতায়, মানতে হবে বাপ-পিতামহ'র ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান—সব কিছু।

কিন্তু বাগ মানলেন না রামমোহন। বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলেন। পথকে করলেন ঘর।

চার বছর ঘুরে বেড়ালেন রামমোহন। ভ্রমণ করে বেড়ালেন ভারত-বর্ষের নানা প্রদেশ। যেখানেই যান, সেখানের ভাষা শেখেন, পড়েন সেখানকার ধর্মগ্রন্থ সব। পড়তে পড়তে তাঁর পূর্ববর্তী ধর্ম প্রবর্তকদের কবিতা, দোঁহা—সব মুখস্থ হ'য়ে গেল। এমন পড়াই পড়লেন রামমোহন। ভারতবর্ষকে তিনি চিনলেন। দেখলেন সর্বত্র এক অবস্থা! অজস্র জাত, অসংখ্য সম্প্রদায়। সবাই হিন্দু অথচ কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করে না, বিশ্বাস করে না এক তিল। বিচিত্র তাদের দেবতা, বিচিত্র

তাদের কুসংস্কার ! ধর্ম, ধর্ম, ব'লে সকলেই চেঁচায়। অথচ মজা এই, একজন যা' মানে অন্যলোক তা' মানে না। একজন যা' মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, অপরে তা' হেসে উড়িয়ে দেয়—বলে, ও কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য ? সারা দেশ খুঁজে দেখলেন রামমোহন। দেখলেন, হিন্দু কোথাও নেই। আছে শুধু কতকগুলো দল, আর আছে একরাশ দেবতা। সত্যের প্রতি কারুর ভক্তি নেই, আছে শুধু কতকগুলো সংস্কার নিয়ে মাতামাতি।

তারপর হিমালয় পেরিয়ে হাজির হ'লেন গিয়ে তিব্বতে। মনে একান্ত ইচ্ছা বৌদ্ধধর্মটাকে ভাল ক'রে জানতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে ভগবান তথাগতের ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব। অন্যদিকে তখন ভারতে বৃটিশ শাসনের ওপর মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা রামমোহনের। রক্ষক যে-দেশের ভক্ষক, শাসক যেখানে প্রতারক, থাকব না সে দেশে, বাস করব না সে রাজার রাজ্যে। তাই চ'লে গেলেন তিব্বত। দুর্গম গিরি লঙ্ঘন ক'রে, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় হাজির হ'লেন গিয়ে লামাদের দেশে।

কিন্তু সেখানে আর এক বিপদ ! পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ক'রে বাবার বিরাগ ভাজন হ'য়েছেন, বিতাড়িত হ'য়েছেন বাড়ী থেকে। কিন্তু এখানেই বা কম কি ? উল্টে অবতারবাদ যে চরমে পৌঁছেচে এখানে। সামান্য একজন মানুষকে খাড়া ক'রে এরা বলে কি না ইনিই হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। হ'লই বা সে দলাই লামা। সেও ত' মানুষ ! তারও ত' দোষগুণ আছে, ভুল-ভ্রান্তি আছে। আবার এক দলাই লামা মারা গেলে তা'রা খুঁজে বা'র করে আর একটি ছেলেকে। শাস্ত্র মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে ঠিক ঠিক লক্ষণগুলো শরীরে প্রকাশ পেয়েছে কি না ! তারপর তা'কে অভিষিক্ত করে এই সম্মানের পদে। বলে, আমাদের লামা ত' মরতে পারেন না। তিনিই ত' জন্ম-মৃত্যুর কারণ। তাঁরই ইচ্ছেয় ত' সৃষ্টি হচ্ছে, তাঁর খেয়ালেই ধ্বংস। তাঁর

আবার মৃত্যু কি ? খেয়াল হয়েছে, তাই এক শরীর ত্যাগ ক'রে নবকলেবর ধারণ করেছেন। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে পরিধান করেছেন নূতন বেশ।

এ যে হ'ল টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস। চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না রামমোহন। পারলেন না এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ না ক'রে। একে ত' সেই বিদেশে বন্ধু কেউ ছিল না। এখন অনেকে শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ চেষ্টা করত রামমোহনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার। যা'তে আর টুঁ শব্দটি করতে না পারেন বাছাধন। কিন্তু বেঁচে গেলেন রামমোহন। বেঁচে গেলেন সে-দেশের মায়েদের চেষ্টায়। লুকিয়ে পা'র করে দিলেন তাঁরা রামমোহনকে।

এদিকে রামকান্তর অবস্থা কাহিল। সত্যযুগে শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে দশরথের যে অবস্থা হ'য়েছিল, রামমোহনের গৃহত্যাগে রামকান্তরও সেই অবস্থা। ছেলের জন্যে প্রাণ যেন ছট্‌ফট্‌ করে। আঁকুপাঁকু করে মন সেই চাঁদমুখখানি দেখবার জন্যে।

খবর পেলেন রামকান্ত, রামমোহন ঘুরতে ঘুরতে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এসেছেন। লোক পাঠিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে ক'রে একেবারে ধরে নিয়ে আসবি, ছাড়বি না কিছুতেই। বলবি আমি তাকে ডেকেছি। ব'লে দিলেন রামকান্ত। সেই লোকের সঙ্গে আবার বাড়ী ফিরে এলেন রামমোহন। ঘরছাড়া ফিরে এলেন ঘরে। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকলেই মহাখুশী। ফুলঠাকরুণের আহ্লাদ আর ধরে না।

॥ পাঁচ ॥

ন' বছর বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন রামকান্ত। একটা নয়, একেবারে তিন-তিনটে বিয়ে। প্রথম বৌ বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই মারা গেলেন। তারপর আর দু'টো। বেশ হ'য়েছে। বাইরে, বিদেশ-বিভূঁয়ে চার বছর ধ'রে অনেক কষ্ট পেয়েছে রামমোহন। এবার বাছাধন আর বোধ হয় টুঁ-ফোঁ করবে না। থাক্ বাবা, ঘরে খা' দা', পড়াশোনা, পুজো-আচ্চা, চাকরি—যা' হয় একটা কিছু কর্। কি দরকার তোর ও সব ঝামেলার মধ্যে যাবার? কম বয়েস, ঘরে সোমত্ত বউ—সংসারধর্ম কর্।

কিন্তু, হ'ল না তা'। প্রথম প্রথম রামমোহন খুব মন দিয়ে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়াশোনা করলেন। কিন্তু সে অল্প দিন। তারপর আবার সেই কেমন বাঁকা বাঁকা কথা। আবার সেই ধর্ম নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক। বিরক্ত হ'তেন রামকান্ত। কিন্তু মুখ ফুটে বড় একটা কিছু বলতেন না। কে জানে বাবা! যে গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে! আবার যদি পালিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

ইংরেজদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছেন রামমোহন। বৃটিশ আইন ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণাও হয়ে গেছে। রামমোহন দেখলেন যে এ-জাত বুদ্ধিমান ও মিতাচারী। যে বিরুদ্ধ-ধারণার বশে একদিন তিনি ভারত ছেড়ে তিব্বত পাড়ি দিয়েছিলেন, সে ধারণা দূর হ'য়ে গেল। মন টানল ইংরেজদের প্রতি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে ইংরেজরা বিদেশী হ'লেও, ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থায়, তাদের শাসন দেশের পক্ষে মঙ্গলজনকই হবে। তাই আবার পৌত্তলিকতা এবং হিন্দুসমাজের অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করলেন তিনি।

কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন রামমোহন। হিন্দুধর্মের যা' কিছু আচার অনুষ্ঠান তা'র বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ আরম্ভ ক'রেছে। বামুন-

পণ্ডিতে একবার যদি খবর পায়, দেবে একবারে একঘরে ক'রে। সমাজে আর ঠাঁই হবে না রায় পরিবারের। তাই ভয় পেয়ে গেলেন রামকান্ত। ছেলেকে আবার বা'র করে দিলেন বাড়ী থেকে। ব'লে দিলেন, টাকা যা' লাগে তা' পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু বাড়ীতে আসিস নি তুই। নিজে ডুব্‌বি ডোব্‌, আমাদের ডোবাস্‌ নি।

রামমোহন এবার সোজা চলে গেলেন কাশী—যে কাশী সর্ব-প্রকাশী। সেখানে এক নাগাড়ে বারো-তেরো বছর ধ'রে পড়লেন হিন্দুশাস্ত্র। সংস্কৃতশাস্ত্র একেবারে গুলে খেলেন।

॥ ছয় ॥

কঠিন অসুখ হয়েছে রামকান্তর। মনে হ'চ্ছে আর বাঁচবেন না। বছর দুই আগেই নিজের সব সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। এবার সব ছেলেদের মুখ দেখে ওপারে যেতে পারলেই হয়। ডেকে পাঠালেন ছেলেদের। রামমোহনও চ'লে এলেন কাশী থেকে। ভগবানের নাম করতে করতে ভবনদী পার হ'য়ে গেলেন রামকান্ত।

শ্রাদ্ধাদি কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রহণ করলেন না রামমোহন। দখল করতে দিলেন না ফুলঠাকরুণ। হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে দেবদেবী মানে না যে, বলে—প্রতিমা পুজো, ওতো পৌত্তলিকতা, সে ছেলে তো বিধর্মী। পিতার সম্পত্তিতে ওর কি অধিকার? নাতি গোবিন্দপ্রসাদকে দিয়ে সুপ্রীমকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করলেন ফুলঠাকরুণ।

কোর্টে হাজির হ'লেন রামমোহন। প্রতিবাদ করলেন মায়ের অভিযোগের বিরুদ্ধে। করলেন তীব্র কণ্ঠে। বললেন, বিধর্মী আমি নই। হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধেও আমার কোন অনুযোগ অভিযোগ নেই। হিন্দু ধর্মের নামে যে বিকৃত ধর্ম দেশে চলছে, কতকগুলো কুসংস্কারপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যে ধর্ম বুক ফুলিয়ে হিন্দু ধর্ম বলে নিজেকে বলে বেড়াচ্ছে, সেই ধর্মকেই আমি আক্রমণ ক'রেছি, তার বিরুদ্ধেই আমার বিদ্রোহ। থ' বনে গেল বিরুদ্ধপক্ষ। প্রমাণ করতে পারলে না রামমোহনকে বিধর্মী বলে। মোকদ্দমায় রামমোহন জিতে গেলেন।

কিন্তু পিতৃধন গ্রহণ করলেন না রামমোহন। দখল করলেন না পৈত্রিক সম্পত্তি।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। অর্জুন বেঁকে বসলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ব'লে দিলেন সোজাসুজি, পারব না এ যুদ্ধ করতে। আত্মীয়স্বজনকে মেরে, তাদের মনে কষ্ট দিয়ে, চাই না আমি রাজ্যাধিকার।

রামমোহনও চাইলেন না সম্পত্তি গ্রহণ করতে আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দিয়ে। মায়ের অধীনেই রইল সব কিছু। তিনিই দেখাশোনা করতে লাগলেন।

বাবা মারা যাবার পর রামমোহন কিছুদিন বাড়ীতেই থেকে গেলেন এবং অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রাধ্যয়ন করে চললেন।

একদিন সকালবেলা স্নান ক'রে রামমোহন একটা নির্জন ঘর দেখে ব'সেছেন। বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণখানা পড়তে হবে। অপঠিত বই, কাজেই খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ছেন। ক্রমে বেলা দু'প্রহর পার হ'য়ে গেল, কিন্তু রামমোহন পড়া থেকে ওঠেন না, আসেন না খেতে। কারুর সাহস হয় না ডাকতে। যে বদ্‌রাগী ছেলে! বারণ করে দিয়েছেন, কেউ যেন কখনো তাঁর পড়ায় ব্যাঘাত না করে। অথচ ছেলে না খেলে ফুলঠাকরুণই বা খান কি ক'রে? ক্রমে তিন প্রহর বেলা গড়িয়ে গেল। তখন গ্রামের এক প্রবীণ ব্যক্তি, রামমোহন তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, তিনি সাহস ক'রে পড়ার ঘরের দরজা একটু খুললেন। বুঝতে পারলেন রামমোহন। ইঙ্গিতে জানালেন, আসছি আর একটু পরেই। খানিকক্ষণ পরেই তিনি বেরিয়ে এসে খাওয়াদাওয়া ক'রলেন। এইভাবে একদিনে একাসনে সাতকাণ্ড রামায়ণ শেষ ক'রলেন রামমোহন। এমনি ঝোঁক ছিল তাঁর পড়াশোনায়!

॥ সাত ॥

কিছুদিন পরে ইংরেজ সরকারের অধীনে সামান্য এক চাকরি গ্রহণ করলেন রামমোহন। তুচ্ছ কেরানীর চাকরি। তখন কেরানীদের ইংরেজ সিভিলিয়ানরা মানুষ বলে মনে করত না। মানুষের অধিকার দাবী করতেও জানতেন না তাঁরা।

সিভিলিয়ান জন ডিগ্‌বি সাহেবের সামনে হাজির হ'য়েছেন রামমোহন, কাজ চাই। সাহেব রাজী হলেন তাঁকে কেরানীর পদে বহাল করতে। কিন্তু এমনি চাক্‌রি গ্রহণ করবেন না রামমোহন, সোজাসুজি ব'লে দিলেন, একটা লেখাপড়া করতে হবে। কেরানী হ'লেও দিতে হবে তাঁকে মানুষের সম্মান। তিনি যখন কাজ নিয়ে সাহেবের সামনে আসবেন তখন তাঁকে বসতে চেয়ার দিতে হবে, কথা ব'লতে হবে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যেমন ক'রে বলে।

এম্‌নি তেজীয়ান তিনি! 'চাক্‌রি করতে এসেছি ব'লে কি আত্ম-সম্ভ্রম খোয়াতে এসেছি? খুসী হ'লেন সাহেব। রামমোহনের কথামতই এক দলিল স্বাক্ষর ক'রে দিলেন।

কাজে যোগ দিলেন রামমোহন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতায় ডিগ্‌বি সাহেব মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেওয়ানি পদে উন্নীত হ'লেন রামমোহন। তখনকার দিনে এই ছিল সর্বোচ্চ পদ যা' দেশীয়রা পেতে পারত। ক্রমে ডিগ্‌বি সাহেবের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হ'ল রামমোহনের। দু'জনে মিলে পড়াশোনা আরম্ভ করলেন। রামমোহন সাহেবকে দেশীয় সাহিত্য পড়ান, বুঝিয়ে দেন। সাহেব সাহায্য করেন বন্ধুকে ইংরাজী সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করতে।...

রংপুরে বদলী হ'লেন রামমোহন। সেখানেও এক কাণ্ড ফেঁদে বসলেন তিনি। সন্ধ্যের পর বাড়ী এসে আসর বসান, নিজে বসেন আড্ডাধারী হ'য়ে। অনেক মাড়োয়ারী আসে সভায়, আসে অনেক লক্ষপতি ব্যবসাদার। সোজা কথায় তিনি তাদের বুঝিয়ে দেন

পৌত্তলিকতার অসারতা, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু গৌরীকান্তর পছন্দ হয় না এ সব। সেও ক্ষমতাশালী, সম্ভ্রান্ত। জজ্ আদালতের দেওয়ান। পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। গৌরীকান্ত রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন। কিন্তু বেশ বাগিয়ে উঠতে পারলেন না। রামমোহনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেন না ভক্তদের।

॥ আট ॥

ভারতবর্ষের সে-এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনের পর বৃটিশ শাসনাধীন হয়েছে দেশ। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বুদ্ধিচাতুর্য্যে ও প্রবল প্রতাপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্ ক্রমশঃ সুদৃঢ় হ'চ্ছে। ধর্মের নামে দেশে কেবল কুসংস্কার ও আমোদ-আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠান। ধনীর অত্যাচারে দরিদ্র উৎপীড়িত, পুরুষের অত্যাচারে নারী।

দারুকেশ্বর নদীর ধারে শ্মশান। ধু ধু ক'রে জ্বলছে চিতানল। মারা গেছে জগমোহন—রামমোহনের বড় ভাই। চারিদিকে তুমুল শব্দে ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছে। কিন্তু সে প্রচণ্ড শব্দ ভেদ করেও কানে আসছে নারীকণ্ঠের কাতর আবেদন।

সতীদাহ হচ্ছে। সুস্থ-সবলা এক নারীকে জোর ক'রে শুইয়ে দেওয়া হ'য়েছে তা'র মৃত স্বামীর চিতায়। এতে নাকি পুণ্যি হবে, অক্ষয় স্বর্গলাভ ক'রবে সহগামিনী স্ত্রী। কিন্তু সেই লেলিহান আগুনের মধ্যে থেকে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছে হতভাগিনী। পালিয়ে আসবে বললেই কি আসা যায়? তোমার ভালমন্দ তুমি যদি না বোঝ, আমরাও কি বুঝব না? দেখব না তোমার হিত? তবে সমাজের মাথায় আমরা বসে আছি কেন?

—কেমন বউ গা? মেয়েছেলের এ আবার কি অন্যায় আব্দার? বুকে বাঁশ দিয়ে চেপে রেখে দাও। বেরিয়ে আসবে শেষকালে! হুকুম দিলেন একজন প্রবীণ ব্যক্তি। সমাজের মাথা।

রামমোহন আগাগোড়া দেখলেন এই অমানুষিক অনুষ্ঠান। ধর্মের নামে, সমাজের নামে, এ কি বর্বরতা? কিন্তু অসহায় তিনি! তাঁর কথা সেখানে শোনেই বা কে? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন রামমোহন, যেমন ক'রেই হোক, এই সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে। মানুষকে—তা' হ'ক না সে মেয়েমানুষ, তা'কেও দিতে হবে তা'র ন্যায়সঙ্গত বাঁচবার অধিকার।

॥ নয় ॥

১৮১৫ সাল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন রামমোহন। পরের দাসত্ব কতকাল করবেন আর? কলুর বলদ হয়ে কতদিন কাটাবেন? ফিরে এলেন নিজগ্রামে, কিন্তু গ্রামের লোকেরা ভালভাবে গ্রহণ করলেন না তাঁকে।

—কি? আমাদের পুজো-আচ্চা হ'ল পৌত্তলিকতা? আমাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা-করা প্রতিমা, সে হ'ল পুতুল? আর তুই আমার মহাজ্ঞানী হয়েছিস্? হ'য়েছিস বেহ্মজ্ঞানী? দেখি, তুই থাকিস্ কি ক'রে সমাজে?

রামমোহনের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয় না কেউ। যে বা রাজী হয়, সমাজ তা'কে শাসিয়ে দেয়। ব'লে দেয়, এমন অপকর্ম কর যদি, দেবো তবে একঘরে ক'রে। দেবো ধোপা-নাপিত বন্ধ-ক'রে। যদি বা কেউ এগিয়ে আসে সাহস ক'রে, সাত হাত পিছিয়ে যায় ভয়ের চোটে। অবশেষে দুঃসাহসের কাজ করল ইড়পাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধনী। নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল রামমোহনের ছেলে রাধা-প্রসাদের। ব'লে দিল সমাজের মাথাদের, পরোয়া করি না তোমাদের। ডরাই না তোমাদের চোখরাঙানি।

কিন্তু রেহাই পেলেন না রামমোহন। ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল রামনগরের সমাজপতি রামজয় বটব্যাল। পাঠিয়ে দিল তা'র দলবল। ভোর হ'তে না হ'তে তারা রামমোহনের বাড়ীর পাশে বিকটশব্দে মুরগীর ডাক ডাকতে আরম্ভ করল। বাড়ীর ভেতর ফেলতে আরম্ভ করল গরুর হাড়, আরও নানান রকম নোংরা জিনিষ।

এ সব সহ্য করতে পারল না রামমোহনের ভাগ্নে গুরুদাস মুখুজ্যে। জোয়ান ছেলে, গায়ে অসীম শক্তি, ভাল লাঠি খেলতেও জানে গুরুদাস। ছুটে চলল সে বটব্যালের দলকে উচিত শিক্ষা দিতে। ধ'রে ফেললেন তাকে রামমোহন। বোঝালেন অনেক। বললেন, দ্যাখো, বিপদে

উত্তেজিত হ'লে চলবে না। অভিভূত হবে না কখনো। বিপদই ত' সম্পদের মূল। দুঃখ পেলেই জানবে যে সুখের মুঁখ দেখতে আর বেশী দেরী নেই। মাঘমাসের প্রচণ্ড শীত, সে তো কেবল বসন্তেরই আগমন বার্তা ঘোষণা করে। আর ছাখো, বড় রাস্তা ধ'রে আলোর মধ্যে দিয়ে সকলেই ত' যেতে পারে। অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ পথ চিনে যে যেতে পারে সেই ত' বাহাদুর! সেই ত' মহৎ! যে যাই বলুক না কেন, কান দেবে কেন তুমি সে-সব কথায়? যত বাধাই আসুক না, তুমি তোমার পথ না ছাড়লেই ত' হ'ল? এত ক'রে তবে শান্ত হ'ল গুরুদাস!

কিন্তু এরা টলাতে পারল না রামমোহনকে। একটি শব্দ করলেন না তিনি, প্রতিবাদ করলেন না একবারও। আস্তে আস্তে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। না, এর সঙ্গে লাগাই মিছে! এততেও যে সাড়া-শব্দ করে না, সে একেবারে নির্বিষ, অপদার্থ। তা'র পেছনে লাগা মানে সময় নষ্ট করা।

কিন্তু বাইরের অত্যাচার বন্ধ হ'লে কি হয়? বাড়ীতে আবার এক নতুন উৎপাত সুরু হ'ল। বাবা বাড়ী থেকে দু' দু'বার বা'র ক'রে দিয়েছিলেন। এবার তাড়িয়ে দিলেন মা। বিধর্মী পুত্রকে সপরিবারে তাঁর জমিদারী থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন ফুলঠাকরুণ। বিনা প্রতিবাদে চ'লে গেলেন রামমোহন। রঘুনাথপুরে এক শ্মশানভূমির উপর বাড়ী তৈরী করলেন। এই ত' উপযুক্ত স্থান সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর। 'শ্মশান ভালবাসি ব'লে শ্মশানে নিয়েছি ঠাঁই।' প্রাণ খুলে গাইলেন রামমোহন।

॥ দশ ॥

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ক'লকাতায় চ'লে এলেন রামমোহন। একশো তেরো নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে ইংরাজী কায়দায় সুসজ্জিত এক বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করলেন।

এইবার আরম্ভ হ'ল কর্মজীবন। মনের মত একটা কর্মক্ষেত্রও পাওয়া গেল এতদিনে। ক'লকাতায় বিরোধিতা থাক্, নীচতা নেই। হিংসা করে বটে এখানের লোকেরা, কিন্তু হিংস্র নয়। দিনরাত মেতে রইলেন রামমোহন সমাজ-সংস্কারের কাজ নিয়ে। হুলস্থূল প'ড়ে গেল ক'লকাতায়। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল সে আন্দোলনের ঢেউ। যেখানেই যাও, রামমোহনের কথা। বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহল, পণ্ডিতের টোল থেকে গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপ—সর্বত্রই এক নাম, রামমোহন। রামমোহনই যেন একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

আদর্শ চরিত্র রামমোহনের। একদিকে বলবীর্য্যে অসাধারণ। বজ্রের চেয়েও কঠিন। অপর দিকে ক্ষমা-ধৈর্যে কুসুমের চেয়েও কোমল। সত্যনিষ্ঠ রামমোহনের ঈশ্বরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। পরোপকারে আপন-ভোলা সন্ন্যাসী। নম্রতা ও বিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেল যেই এল তাঁর কাছে। ফুল ফুটেছে। গন্ধে পাগল হ'য়ে ছুটে এল মৌমাছির দল। এল মস্ত মস্ত লোক—রাজা বদনচন্দ্র রায়, রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ। এল দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এল টাকির কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার অন্নদা বাঁড়ুজ্জে। কিন্তু শত্রুর সংখ্যাও কম হ'ল না রামমোহনের। কেউ বা সামনাসামনি বিরোধিতা আরম্ভ করল। কেউ বা সামনে রইল বন্ধু হ'য়ে, আড়ালে করতে লাগল শত্রুতা। তলে তলে চেষ্টা চলতে লাগল রামমোহনের সর্বনাশ করবার।

॥ এগার ॥

ক'লকাতায় এসে প্রচার আরম্ভ করলেন রামমোহন। নিজের পয়সায় বই ছাপাতে আরম্ভ করলেন। শাস্ত্র ঘেঁটে দেখালেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে ছিলেন; শঙ্করাচার্যের ভাষ্যেও এই মত স্পষ্টভাবে লেখা আছে। তাই বাংলা ভাষায় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করলেন। সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র থেকে রামমোহন প্রমাণ করলেন যে এক-মাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বিপদ হ'ল বিরুদ্ধ পক্ষের। বেদব্যাসকেও কেউ উড়িয়ে দিতে পারেন না। পারেন না শঙ্করাচার্যকে অমান্য করতে। মাদ্রাজীপণ্ডিত শঙ্কর শাস্ত্রী জবাবে বই লিখলেন। রামমোহন তাঁর জবাব খণ্ড খণ্ড করে তাঁকে করলেন নিরুত্তর। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে মস্ত বিচার সভা বসল বড় বাজারের ধনী বিহারীলাল চৌবের দালানে। বিচার সভায় পরাস্ত হলেন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। রাম-মোহনকে প্রশ্ন ক'রে বড় বড় বাঙ্গালী পণ্ডিতরা বই লিখতে লাগলেন। ভাবলেন এবার বাছাধন জব্দ হবে। রামমোহন তার প্রত্যেকটির জবাব দিলেন। তারা প্রশ্ন করলেন যে, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা কি কখনও সম্ভব? যিনি জগৎকর্তা ব্রহ্ম, তিনি ত' বাক্যমনের অগোচর। তাঁকে ধারণাই করতে পারবে না, তবে উপাসনা করবে কি ক'রে? তাই যে কোনও সাকার জিনিষকে ধ'রে নাও জগতের কর্তা ব'লে, তাঁরই উপাসনা কর। সেই উপাসনাই গিয়ে পৌঁছবে নিরাকার ব্রহ্মের কাছে।

বেশ, তাই যদি হয়, তা' হ'লে মনে কর একটা ছেলেকে ছেলেধরায় নিয়ে গিয়ে হাজির করল সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পারে এক দেশে। সেখান থেকে সে কোনো খবরই পায় না ত'ার বাবার, জানতে পারে না সে তাঁর ঠিকানা। তা' হ'লে কি সে বড় হ'য়ে যে জিনিষই সামনে দেখবে, তাকেই বাবা বলে মনে করবে? পূজো করবে সেই জিনিষের? অসম্ভব তা'। সে যদি পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করতে চায়, তবে বলবে,

যিনি আমার পিতা তাঁর মঙ্গল হোক্। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। সেই রকম পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর বটেন, তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই সত্যি, তবু জগতের স্রষ্টা, পালক এবং সংহর্তা ব'লে তাঁর উপাসনা করা যেতে পারে। সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা অনেক বড়। অনেক শক্তিমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এ জগৎ কত ছোট, আর এই ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি জিনিষকে কল্পনা করব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হিসাবে? এ কি পাগলামি? আর নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব কি অসম্ভব? তাকিয়ে দেখো একবার দেশ-বিদেশের দিকে, ঘরে-বাইরে। কত জাতই ত' নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করছে। তুরকী ও আরবী মুসলমানরা—উচ্চতম শ্রেণী থেকে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত—সকলেই মূর্তিছাড়া পরমেশ্বরের উপাসনা করে। ইউরোপের প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানরাও তাই। কবীর নানকের শিষ্যরাও মূর্তি পুজো করে না। তবে তুমিই বা পারবে না কেন? ওদের উপাসনা কি উপাসনা নয়? সাধনার পথ ত' সর্বদেশে এক নয়। যত মত তত পথ। তাই উত্তম পথ আশ্রয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বিধি আছে তা' দুর্বল অধিকারীর জন্য। সত্য এবং শ্রেষ্ঠ উপাসনা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা।

কিন্তু এতেই শেষ নয়। আবার সাকারবাদীরা যুক্তি হাজির করলেন। বললেন, বাপ-পিতামহ, আত্মীয়-স্বজন সকলে যে মত মেনে গেছেন, এখনও মানছেন যে মত, তা'র বিরুদ্ধ আচরণ করা অত্যন্ত অন্যায়।

কিন্তু এ তো স্নেহ-ভক্তির কথা। যুক্তির কথা ত' এ নয়। মানুষের সৎ অসৎ বিচার করবার বুদ্ধি আছে। অন্ধের মত, পশুর মত, সংস্কার বশে সে ত' কোনও কাজ করতে পারে না। আর তাই যদি হবে, তবে তোমাদের মধ্যেই ত' কত লোক শাক্ত বংশে জন্মে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করছে, পরমবৈষ্ণব ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে করছে শক্তির উপা-

সনা! আর সব কাজই কি পূর্বপুরুষদের প্রথা অনুযায়ী কর? সকলেই ত' বলে যে পঞ্চব্রাহ্মণ যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের পায়ে ছিল মোজা, গায়ে ছিল জামা! এখন তবে জামা-মোজা ব্যবহার কর না কেন? এখন ত' বেশ বামুনের ঘরে জন্মিয়ে ম্লেচ্ছ ইংরেজের অধীনে চাকরি কর নির্বিচারে। চাক্‌রির লোভে পড় তা'দের শাস্ত্র, পড়াও সেই যবনদের। এ সব কি তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা করত? না এ-সব প্রথা প্রচলিত ছিল পূর্বকালে? তবে? এ-সব ব্যাপারে যদি পূর্বপুরুষদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করতে পার, কেন পার না উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করবার সময়ে?

আচ্ছা, তা' না হয় হ'ল। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা করলে লোকের যে আর ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সুগন্ধ-দুর্গন্ধের জ্ঞান, অগ্নি-জলের জ্ঞান থাকে না। একেবারে পাগল হ'য়ে যেতে হয়। ভেদ থাকে না মানুষে-কুকুরে। পঞ্চ-চন্দন সমজ্ঞান হ'য়ে যায়। সবই তো ব্রহ্মময়! এ অবস্থায় সংসারী লোক কি ক'রে এ উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে?

রামমোহন জিজ্ঞেস করলেন সাকারবাদীদের, নারদ, জনক, বশিষ্ঠ, ব্যাস, কপিল—এই যে তোমাদের মুনি-ঋষিরা, এঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, একথা মানো ত'? না মেনে উপায় কি? শাস্ত্রে যে আছে এ কথা! তবে? প্রশ্ন করলেন রামমোহন। তাঁরা কি ক্ষেপে গিয়েছিলেন? লৌকিক আচরণ কি তাঁদের অস্বাভাবিক ছিল? মোটেই না, সংসারের কাজ, রাজকাজ—সবই তাঁরা করতেন অন্য পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত। তবে এ সন্দেহ জাগছে কেন মনে যে ব্রহ্মোপাসনা করলেই তুমি ক্ষেপে যাবে?

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন। ব'লে দিলেন, বাইরে থাকবে বিষয়ী হ'য়ে, কিন্তু অন্তরে থাকবে সন্ন্যাসী, সর্বকামনা বাসনা বিবর্জিত। বাইরে দেখাবে, তুমিই যেন কর্তা, মনে মনে জানবে যে তুমি কেউ নও। তুমি দেবতার হাতে ক্রীড়নক মাত্র। মনে মনে

আত্মসমর্পণ ক'রে দেবে শ্রীভগবানের চরণে। এইভাবে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ঠিক বজায় রাখবে, অথচ মনে মনে থাকবে সর্বত্যাগী।

বেশ ত' বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছ? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি নিজে কি ব্রহ্মজ্ঞানীর মত কাজ কর? সব জিনিষে ব্রহ্মবোধ ক'রে পঙ্ক-চন্দন, শীত-উষ্ণ, চোর-সাধু—এ সমস্ত এক মনে কর কি?

বিনীতভাবে স্বীকার করলেন রামমোহন তাঁর অপরাধ, দুর্বলতা। বললেন, সত্যিই আমি করি না। কিন্তু তোমাদেরও ত' উপদেশ, ইষ্ট দেবতাকে সর্বময় ব'লে অনুভব করবে। তোমরা ত' মানো না সে কথা। তুমি শাক্ত, তুমি ত' শাক্তের মত কাজ কর না। বৈষ্ণব তুমি, তোমারও আচার বৈষ্ণবের মত নয়। তবে একলা আমাকে দোষ দাও কেন?

এবার সাকারবাদীরা আনলো উপমা। বললে, কি জানো? পরমেশ্বরের কাছে যাওয়া আর রাজার কাছে যাওয়া একই রকম। রাজার কাছে যেতে হ'লে তাঁর দারোয়ানের খোসামোদ করতে হয়, ভেজাতে হয় তাকে। হাতে একটু আধটু কিছু দিতেও হয়, তবে না সে নিয়ে যায় রাজার কাছে? সেই রকম আমাদেরও আসল উদ্দেশ্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। কিন্তু সে তো সহজ নয়, তাই প্রথমে রূপগুণবিশিষ্ট এক মূর্তির উপাসনা করি। তোষামোদ করি দারোয়ানের। তিনতলা বাড়ীর ওপরে উঠবো, একেবারেই কি ওঠা যায় সেখানে? একটা একটা ক'রে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠ্‌তে হয়। আমাদের মূর্তি পুজোও সেই সিঁড়ি ভাঙ্গা, লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রস্তুতি!

বেশ, বেশ! খাসা উপমা দিয়েছো। কিন্তু রাজার কাছে যাবার জন্য দারোয়ানের খোসামোদ কর যখন, তখন তাকেই ত' আর রাজা বল না। তবে তোমাদের এই মূর্তিগুলোকে নিয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা কর কেন? আর, তা' ছাড়া তোমাদের উপমাটাও বাপু ঠিক নয়! রাজার চেয়ে রাজার দারোয়ানের কাছে যাওয়া সহজ, তাকে

ধরা সহজ। কাজেই তাকে সঙ্গে ক'রে রাজার কাছে যাওয়া সুবিধে। কিন্তু ব্রহ্মের বেলা যে অন্যরকম। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। সব সময়ে আছেন আমাদের কাছে কাছে। আমরা দেখতে পাই না তাই। কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে থেকে তিনি সব সময়ে আমাদের দেখছেন। 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছো নয়নে নয়নে।' আর হাতে গড়া তোমার ঐ মৃন্ময়ী প্রতিমা, যাতে তুমি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর বল, সেখানে কি সর্বক্ষণ ব্রহ্ম থাকেন? কখনও থাকেন, কখনও থাকেন না। কাজেই এই মূর্তির মারফত ব্রহ্মলাভ অপেক্ষা, সোজা ব্রহ্মোপাসনা ক'রে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অনেক সহজ, অনেক সুবিধে।

বেশ কথা। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করব কি ক'রে তা' বাত্‌লে দাও।

—সেও তো তোমাদের শাস্ত্রেই আছে। নতুন ত' কিছু বলবার নেই, করবার নেই। তোমরা যা'কে অপৌরুষেয় বল, সেই বেদেই আছে, আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তন করবে এবং ধ্যান করতে চেষ্টা করবে। থামলে চলবে না। চালিয়ে যেতে হবে। যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন ক'রে যেতে হবে। মন আর ইন্দ্রিয়—এ দু'টোকে নিজের বশে রাখতে হবে। একবার যদি এই জ্ঞানলাভ করতে পার —হ'তে পারো ব্রহ্মজ্ঞানী—তবে আর জন্মলাভ করতে হবে না।

আর এ উপাসনা শুধু সন্ন্যাসীর জন্যে নয়, নয় কেবল গৃহত্যাগীর জন্যে। গৃহস্থেরও সমান অধিকার আছে এ উপাসনায়। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কোনও তীর্থের প্রয়োজন নেই, দরকার করে না কোনও বিশেষ দেশে যাবার। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেখানেই ব্রহ্মের উপাসনা করবে।

ক্ষেপে উঠল নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, কি? যে বেদ ব্রাহ্মণ ছাড়া কোনও মানুষের ছোঁবার অধিকার পর্যন্ত ছিল না, রামমোহন তা অনুবাদ ক'রে ছাপিয়ে ম্লেচ্ছের হাতে পর্যন্ত তুলে দিল। যে প্রণব

শব্দ কোনও অব্রাহ্মণ উচ্চারণ করলে তা'র জিভ্ কেটে দেওয়া হ'ত, আচণ্ডাল সকলের মুখে সেই ওঁ শব্দ তুলে দিতে চেষ্টা করছে রামমোহন? এ ম্লেচ্ছাচারের শেষ কোথায়? ঘোর কলি উপস্থিত। পৃথিবী এবার নিশ্চয় ধ্বংস হবে। অজস্র গালিগালাজ করতে লাগল তা'রা রাম-মোহনকে লক্ষ্য ক'রে।

॥ বারো ॥

এইভাবে কাগজে কলমে চললো তর্কযুদ্ধ। কিন্তু তারা হারাতে পারল না রামমোহনকে। ভট্‌চায, গোঁসাই—সকলের যুক্তিই উড়ে গেল রামমোহনের যুক্তির কাছে।

তখন একজন ভাল উপায় গ্রহণ করলেন। তিনি একটি প্রাকৃতিক ঘটনার সুযোগ নিয়ে চালাকি ক'রে রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন। ১৮১৫ সালে রামমোহনের বই প্রকাশিত হ'য়েছিল। ১৮১৭ সালে ভাগীরথীর প্রবাহ ঘুরে গেল। কাশিম বাজারে মহামারী দেখা দিল। লোকজন এখান থেকে পালিয়ে গেল দলে দলে। কলেরা হ'য়ে যশোরেও অনেক লোক মারা গেল। বিরুদ্ধদল প্রচার করতে আরম্ভ করল, রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারই এই সব বিপদের মূল কারণ। তার ম্লেচ্ছাচারের জন্যই ভগবান এই সব বিপদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

অদ্ভুত যুক্তি! বেশ, তা' না হয় হ'ল! কিন্তু তুমি যে বলছ, তোমার কি কিছুদিন আগে অসুখ হয় নি? মিথ্যে অপবাদে জড়িয়ে প'ড়ে একগাদা টাকা খরচ কর নি তুমি? হও নি অপমানিত? তখন ত' বাপু আমার বই বেরোয় নি! ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার তখনও ত' আরম্ভ করি নি আমি! তবে কেন হ'ল? ব্যাপার কি জান? তোমার মঙ্গল অমঙ্গল তোমার নিজের কাজের ওপর নির্ভর করে। তা'তে কে একখানা বই ছাপালো, কে ছাপালো না, তা'র কোনই সম্বন্ধ নেই।

বেশ, বেশ। তুমি ত' নিজেকে খুব ব্রহ্মজ্ঞানী ব'লে জাহির করছ। খুব বুলি আওড়াচ্ছ শাস্ত্র থেকে। কিন্তু শাস্ত্রেই ত' বলেছে যে, যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানতে পারি নি, তিনিই তাঁকে জেনেছেন; আর যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জেনেছি, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন না। তবে রামমোহন, তুমি ত' কেবল ধাপ্পা দিচ্ছ। ব্রহ্মজ্ঞান ত' তোমার হয় নি। হ'লে এত প্রচারে ঝোঁক থাকত না। ঘট তোমার ভরে নি,

ভরলে থলথলাতে না এত। শব্দ কম হ'ত। থাকতে মৌন হ'য়ে। আর ব্রহ্মজ্ঞানীই' যদি হ'য়ে থাকো, তবে যবনদের মত পোষাক প'রে দরবারে যাও কেন ? এটা কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয় ?

॥ তেরো ॥

গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে বিবাদ ত' একরকম শেষ হ'ল। এবার আরম্ভ হ'ল খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বিবাদ।

পরাধীন দেশে রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার রামমোহন একটুও পছন্দ করতেন না। ইংরেজরা ভারতবর্ষ অধিকার করার পর প্রথম ত্রিশ বছর কারুর ধর্মের বিরোধিতা করে নি। এমন কি এই সময়ে খৃষ্টধর্ম প্রচারের অপরাধে একজন পাদ্রী সাহেবকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশে ভারতবর্ষ ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যেতে হ'য়েছিল। তখন সর্বদা ভয় ছিল পাছে দেশীয় লোকেরা ধর্মের জন্য বিদেশী রাজশাসনের ওপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়।

কিন্তু তারপর তা'রা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচার করতে আরম্ভ করল। কখনও বা লোভ দেখিয়ে দেশী লোককে খৃষ্টান করতে লাগল। রাজশক্তির সহায়ে আরম্ভ করল ধর্মপ্রচার। এর বিরুদ্ধে রামমোহন প্রতিবাদ তুললেন। তিনি দেখালেন যে যীশুখৃষ্টের শিষ্যেরা যেসব দেশে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেখানে তাঁদের কোনও অধিকার বা ক্ষমতা ছিল না। কোনরকম রাজশক্তির আশ্রয় তাঁরা নেন নি। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে নির্ভয়ে ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এই হ'ল সত্যিকার ধর্মপ্রচার। যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দাও যে তোমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ। বেয়নেট্ দিয়ে বা চাক্‌রির লোভ দেখিয়ে ধর্মপ্রচার উত্তম পথ নয়।

পাদ্রীসাহেবরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলেন। বললেন, ও কি আবার একটা ধর্ম? যাদের ধর্মশাস্ত্রে, পুরাণে, ঈশ্বরের সাকারত্ব স্বীকার করা হ'য়েছে তা'রা এখনও সভ্যতার আলো দেখে নি। আহ্বান জানালেন তাঁরা হিন্দুদের অন্ধকার থেকে আলোয় আসবার জন্য। আর সেই সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন যে এর একমাত্র উপায়

হ'চ্ছে ভগবান যীশুখৃষ্টের ধর্মগ্রহণ করা। একমাত্র প্রভুর রক্তই তাদের পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। তিনিই একমাত্র ত্রাণকর্তা।

রুখে দাঁড়ালেন রামমোহন। প্রশ্ন করলেন পাদ্রীদের। বলো, ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ পুরাণের মত তোমাদের বাইবেলেও আছে কি না। তোমরা মানবাকারবিশিষ্ট যীশুখৃষ্টকে এবং কপোতাকার বিশিষ্ট হোলিগোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বল কি না? ভগবান যীশু তাঁর মা, ভাই ও আত্মীয়দের সঙ্গে অনেকদিন একসঙ্গে বাস করেছিলেন কি না? তাঁর জন্ম-মৃত্যু হ'য়েছিল এ কথা অস্বীকার কর কি? কপোতরূপ হোলিগোষ্ট এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেন এ কথা মানো ত'? মা মেরীর গর্ভে ভগবান যীশু সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এও ত' তোমাদের শাস্ত্রের কথা। তবে? তোমাদের উন্নত ধর্মের শাস্ত্র বাইবেলেই যদি ঈশ্বরকে সাকাররূপে বর্ণনা করা হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে হিন্দুদের পুরাণই বা কি দোষ করল? তোমরা যদি বল যে ঈশ্বরের শক্তিতে অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়, তা' হ'লে সাকারবাদী হিন্দুরাও ত' সে-কথা বলতে পারেন। তাঁরাও ত' ঐ যুক্তি দিয়ে তাঁদের অবতারদের ঈশ্বরত্ব প্রচার করতে পারেন।

কি জান? ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভৃতি পুরাণের যে সব দোষের কথা তোমরা বলছ, তা' প্রকৃতপক্ষে পুরাণের দোষ নয়, বাইবেলেরই দোষ। কারণ পুরাণে পরিষ্কার ক'রে এ কথা লেখা আছে যে ঈশ্বরের সাকারত্ব ও ইন্দ্রিয় ভোগাদি যে সব বর্ণনা আছে, সে সমস্তই কাল্পনিক। অল্পবুদ্ধি, নিম্নাধিকারী লোকদের হৃদয়গ্রাহী করবার জন্যেই ও-সব কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু তোমরা মিশনারি সাহেবরা বলো যে বাইবেলে ঈশ্বরের সাকারত্ব ও ইন্দ্রিয়ভোগাদির যে বর্ণনা আছে, তা' সত্য। কাজেই এ অপরাধে তোমরাই বেশী অপরাধী।

তা' ছাড়া তোমাদের প্রচারের মধ্যে কোন যুক্তিই নেই। তোমরা যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলো, আবার সাক্ষাৎ ঈশ্বরও বলো। পুত্র

যে কি ক'রে সাক্ষাৎ পিতা হ'তে পারেন, তা' ত' আমরা বুঝি না। কখনও কখনও যীশুখৃষ্টকে তোমরা মানুষের সন্তান বলো, আবার এও বলো যে কোনো মানুষ তাঁর পিতা ছিল না, এ কথার মানে কি ?

এই বলছো যে ঈশ্বর এক, আবার পরমুহূর্তে বলছো তিন ঈশ্বরের কথা। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর। এ রকম উল্টোপাল্টা কথার তাৎপর্য কি ? তোমরাই বলো যে পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা অর্থাৎ আত্মারূপে তাঁর উপাসনা করা উচিত। তবে তোমরা জড়শরীরবিশিষ্ট যীশুখৃষ্টকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মনে ক'রে আরাধনা করো কেন ?

এত যেখানে তোমাদের গোলমাল, এত উল্টোপাল্টা কথা, সেখানে বিশ্বাস করি কি ক'রে তোমাদের ধর্ম ? গ্রহণ করি কি ক'রে তোমাদের শিষ্যত্ব ? হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে শরণ নি' কি ক'রে তোমাদের দেবতা যীশুখৃষ্টের ?

পাদ্রীসাহেব উত্তর দিলেন। বললেন, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর। এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ নিবাস, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তা। কিন্তু এই তিনে মিলে এক। এ যে কেমন ক'রে হয় তা আমরা বুঝি না, কিন্তু বিশ্বাস করি।

ঐ এক কথা আমরাও ত' বলতে পারি। আমাদের পুরাণে যে অদ্ভুত, অলৌকিক, অসম্ভব সব ব্যাপার আছে, সেগুলোও যে কেমন ক'রে হয় তা' আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু হয় যে এ কথা বিশ্বাস করি।

আর তিন জন আলাদা আলাদা লোক বা তিনটে আলাদা আলাদা জিনিষকে এক মনে করা এ যেন অতি বড় পাগ্‌লামি। একজন পিতা-পরমেশ্বর স্বর্গে আছেন, সেখান থেকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি পুত্র যীশু খৃষ্টের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করছেন। পুত্র তখন পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার করছেন, কিন্তু এই ছু' জনের মধ্যে ত' যোগ থাকা চাই, তাই তৃতীয় ব্যক্তি হোলিগোষ্ট স্বর্গ-মর্ত্ত্য—এই ছু'য়ের মধ্য থেকে পিতার ইচ্ছে

অনুসারে পুত্রের কাছে এসে হাজির হ'চ্ছেন। এই ত' তোমাদের শাস্ত্রে বলে, কিন্তু নিবাসের পার্থক্য, আধারের পার্থক্য, ক্রিয়া-কর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি বলো যে এই তিনজন মিলে এক, অভিন্ন, তা হ'লে দু'টো জিনিষ যে আলাদা আলাদা তা' জানবার ত' কোনো উপায়ই নেই। গাছ আর পাহাড়, মানুষ আর পাখী—এরা যে আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা ত' কিছুতেই বলা চলে না। তার মানে তোমাদের কথা যুক্তিহীন, তোমাদের যুক্তি অর্থহীন। তোমাদের অবস্থাটা কি রকম জান ? ঠিক যেন একজন অন্ধ আর এক অন্ধকে অন্ধ ব'লে ঠাট্টা করছে, নিন্দে করছে। একজন খোঁড়া আর এক খোঁড়াকে বিদ্রূপ করছে সে সোজা হ'য়ে ভাল ক'রে হাঁটতে পারে না ব'লে।

এইভাবে পাদ্রীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ চালিয়ে চললেন রামমোহন, খুব ভাল ক'রে গোটা বাইবেলটা প'ড়ে ফেললেন, কিন্তু ইংরিজী অনুবাদ প'ড়ে বেশ তৃপ্তি হ'ল না, ছ'মাসের মধ্যে শিখে ফেললেন গ্রীক্ আর হিব্রু। নতুন-পুরানো—দু'খানা মূল বাইবেলই প'ড়ে ফেললেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এই সময়ে বাইবেলের অনুবাদ সূত্রে পাদ্রী আড্যাম সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা হ'ল। খৃষ্টধর্মে এক দেবতা না তিন জন দেবতা, এই নিয়ে আলোচনা করতে করতে আড্যাম সাহেব ত্রিতত্ত্ববাদের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রামমোহনকে ত্রিতত্ত্ব-বাদী খৃষ্টান করা। কিন্তু এখন তিনি নিজেই ও মত ত্যাগ করলেন। নিজেকে প্রচার করলেন একেশ্বরবাদী ব'লে। খৃষ্টানরা তাঁর নাম দিল "Second fallen Adam।" অর্থাৎ শয়তানের হাতে প'ড়ে আদমের যেমন পতন হয়েছিল, রামমোহনের পাল্লায় প'ড়ে আড্যাম সাহেবেরও সেই অবস্থা।

১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক'লকাতা ইউনেটেরিয়ান কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হ'ল। খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করাই এই

কমিটির মূল উদ্দেশ্য। এইভাবে রামমোহন ও আড্যাম সাহেব একসঙ্গে মিলে ইউনেটেরিয়ান খৃষ্টধর্মকে ভিত্তি ক'রে প্রথমে ধর্মসমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ উদ্যম সফল হ'ল না। এই বিদেশী গাছটি ভারতের জমিতে বাঁচতে পারল না।

॥ চৌদ্দ ॥

এই ইউনেটেরিয়ান সোসাইটির সভায় খৃষ্টান মতানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করা হ'ত। এই সভায় রামমোহন নিয়মিত যেতেন, তাঁর বন্ধু-বান্ধবও কেউ কেউ কোনো কোনো দিন যেতেন তাঁর সঙ্গে। একদিন সভা থেকে ফেরবার পথে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী আর চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনকে বললেন, "বিদেশীদের ও উপাসনায় আমরা যাব কেন? যাবার প্রয়োজন কি আমাদের? আমরা ত' নিজেরাই একটা উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারি!" কথাটা রামমোহনের মনে লাগল। চিৎপুর রোডের পাশে এক টুকরো জমি কিনে তা'র ওপর তৈরী করালেন বর্ত্তমান সমাজগৃহ। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই নতুন মন্দিরে সমাজের কাজ আরম্ভ হ'ল।

এইভাবে খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে হিন্দু-আচারে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করবার জন্যে রামমোহন ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এতে ইংরাজরা খুবই দুঃখিত হ'লেন। তাঁদের বড় আশা ছিল যে রামমোহনকে দিয়ে এদেশে ক্রমশঃ খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে পারবেন। কিন্তু এখন সে আশা নির্মূল হ'ল।

এর আগেই রামমোহনের প্রতিভার কথা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে এক মহাসভা হয়। চারদিক থেকে মস্ত মস্ত ধনী, সম্ভ্রান্ত লোক, প্রধান প্রধান পণ্ডিত আসে সে সভায়। রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে হারাবার জন্যে কলকাতায় সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব ডেকে নিয়ে এলেন বড় বড় ভট্চাযদের। রামমোহনকে অপদস্থ করবার জন্যে অনেক ষড়যন্ত্রও ক'রা হ'ল, কিন্তু ভগবানদত্ত প্রতিভার কাছে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। সভায় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। রাম-মোহন তাঁর মতের বিরুদ্ধে নিজের যুক্তি দেখালেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলল। অবশেষে নিরস্ত হ'লেন শাস্ত্রী। মেনে নিলেন নিজের পরাজয়।

রামমোহনের অসামান্য ক্ষমতার কথা বিদ্যুতের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তাই এখন ব্রাহ্মসমাজ করতে খানিকটা সুবিধেও হ'ল। কিছু কিছু লোক এল এ সমাজে। জাত-ধর্মের কোন বাধা নেই। হও না তুমি যে কোনো জাতের লোক, কি, যে কোন ধর্মের, এখানে তোমার অবারিত দ্বার। দেখবে না কেউ সমাজের কোন্ স্তর থেকে তুমি এসেছ, কোন্ ধর্মাবলম্বী তুমি আগে ছিলে। সমান অধিকার তুমি পাবে উপাসনা করবার। পাবে সমান সুযোগ। তবে হ্যাঁ, কোনো রকমের মূর্তি পূজা করতে পারবে না এখানে, পারবে না উপাসনার নামে পশুহত্যা করতে। খানাপিনাও চলবে না মন্দিরের মধ্যে, চলবে না পরধর্মের নিন্দা করা, অথবা অন্য ধর্মের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা।

ভারতের অতীত গৌরবময় দিনে ভগবান্ তথাগত একবার শুনিয়ে-ছিলেন বিশ্বব্যাপী মৈত্রীর বাণী। বহু শত বৎসর পর রামমোহন আবার আহ্বান জানালেন। বললেন, "ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন—সকলে এসো। এসো, আমরা ভাই-ভাই মিলে এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করি। তুমি যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই হও না কেন, চলে এসো। সার্বভৌমিকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, আদি-অন্ত-হীন পরব্রহ্মের পূজা কর।"

আর এ সমাজের নিয়মকানুনও খুব বেশী নয়। প্রথম কথা ভগবানের ওপর বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকা চাই। এ তো হ'ল অন্তরের কথা। আর বাইরে চাই পরস্পরের মধ্যে ভদ্র ব্যবহার। খৃষ্টান প্রচারকরা বলেন যে, এই পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে একমাত্র যীশুর উপদেশই Positive। তিনি বলেছেন যে অন্যে তোমার প্রতি যে ব্যবহার করলে তুমি খুশী হও, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করবে। এ একেবারে পরিষ্কার কথা—কি রকম ব্যবহার করা উচিত, তা স্পষ্ট ক'রে বলে দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু যীশুর আগে যে সব ধর্ম্মপ্রচারকরা

উপদেশ দিয়েছেন তাঁদের উপদেশ Negative। অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে তুমি কি রকম ব্যবহার করবে না সে কথাই তাঁরা ব'লে গেছেন। চীন-দেশের জ্ঞানী কনফুসিয়াসের বই, মহাভারত, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটক—সর্বত্রই এই এক উপদেশ। রামমোহন প্রতিবাদ ক'রলেন এ কথার। ত্রিপিটক ও সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখালেন যে খৃষ্টদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে Positive উপদেশ এই সব ধর্ম্মপ্রচারকরা দিয়ে গেছেন। তিনি এই দুটো উপদেশই নিলেন। নিয়ে বললেন, 'অন্যে আমাদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করলে আমরা সন্তুষ্ট হই, অন্যের সঙ্গে আমরাও সেইরকম ব্যবহার করব; আবার অন্যলোক আমাদের প্রতি যে-রকম ব্যবহার করলে আমরা অসন্তুষ্ট হই, অপরের প্রতি আমরা কখনই সেরকম ব্যবহার করব না।'

এ তো খুবই ভাল কথা। এতে আপত্তি ক'রবার ত' কিছু নেই। তবু গোঁড়া হিন্দু যাঁরা তাঁরা বিরুদ্ধ প্রচার চালাতে লাগলেন ঠিক। ব'লে বেড়াতে লাগলেন, আরে জানি না, ওরা মন্দিরের মধ্যে কি করে? স্বচক্ষে দেখেছি উপাসনার দিন এক একটা আস্ত বাছুর মাবে, আর মনের খুশীতে চালায় খানাপিনা। মদ না হ'লে তো উপাসনা সভার কাজই চলে না। নাচ-গান না হ'লে পূর্ণ হয় না অনুষ্ঠান।

॥ পনেরো ॥

বলা বাহুল্য যে এ প্রচার সর্বৈব মিথ্যে। তবে হ্যাঁ, রামমোহন মদ খেতেন। কিন্তু তা উপাসনা মন্দিরে কোনো দিনই নয়। মদ্যপান নিয়ে তিনি একখানা বইও লিখলেন, এবং তাতে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে প্রমাণ করলেন যে শূদ্রের পক্ষে সুরাপান মোটেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, এমন কি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতেরও শাস্ত্রীয় অধিকার আছে মদ্যপান করার। মজার ব্যাপার, শুনে আশ্চর্য্য লাগে যে, রামমোহনের মত লোক মদ্যপান সমর্থন ক'রে প্রচারের জন্য বই ছাপালেন। এর কারণটা জানতে গেলে জানতে হয় সে-সময়কার ইতিহাস। এখন যেমন আমরা সুরাপানের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করছি, রামমোহনের সময়ে তার কিছুই ছিল না। হিন্দুসমাজের মধ্যে বিলিতী সভ্যতার আধিপত্য তখন এত দূর বিস্তৃত হয় নি। তাই সুরাপান করাটাকে রামমোহন খুব দূষণীয় মনে করতেন না। তবে অতিরিক্ত পানের প্রতি তাঁর আন্তরিক ঘৃণা ছিল। মদ খেয়ে মাত্‌লামি করাটা তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। নিজে তিনি খুব অল্প পরিমাণ মদ খেতেন। তাতে তাঁর চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ত না কখনও। কখনও হারিয়ে ফেলতেন না নিজেকে। যাতে বেশী মাত্রায় না খেয়ে ফেলেন, তার জন্যে রামমোহন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যতবার তিনি একটু ক'রে সুরা পান করতেন, প্রত্যেকবার একটি ক'রে কপর্দক সামনে রেখে দিতেন। এতে লাভ হ'ত এই যে একটা নির্দিষ্টসংখ্যক কপর্দক সামনে জমলেই তিনি আর কিছুতেই সুরা স্পর্শ করতেন না। একদিন ভারী মজা হয়! রামমোহনের এক বন্ধু তাঁকে উন্মত্ত ক'রে মজা দেখবার জন্যে কয়েকটি কপর্দক তাঁর অসতর্কমুহূর্তে চুরি করে নিলেন। কাজেই ভুল ক'রে রামমোহনের সুরাপানের মাত্রা বেশী হয়ে গেল। রামমোহন বুঝতে পারলেন এ কারসাজি। কোন-দিন তো শরীর এমন হয় না, হয় না এমন চিত্ত-চাঞ্চল্য। তবে আজ

কেন এমন হ'ল? নিশ্চয়ই কেউ আমার কপর্দক চুরি করেছে। খানিকক্ষণ বাদেই জানতে পারলেন কে এই অপকর্মটি করেছেন। খুব রেগে গেলেন রামমোহন। তিরস্কার করলেন সেই বন্ধুকে। বললেন, শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত। শাস্ত্রে বলেছে "বরং পণ্ডিত শত্রু ভাল, অথচ মূর্খ বন্ধু ভাল নয়।" তোমার মত মুর্খের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব না হ'লেই ছিল ভাল। অতিরিক্ত সুরাপানের প্রতি তাঁর এমনই বিদ্বেষ ছিল। আর একবার তাঁর কোনো বন্ধু সুরাপান ক'রে উন্মত্ত হয়েছেন, এই খবর পেয়ে রামমোহন ছ মাস সেই বন্ধুর মুখদর্শন করেন নি।

॥ ষোল ॥

রামমোহনের বড় ভাই জগন্মোহনের মৃত্যুতে বৌদি অলকমণি দেবীকে হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। তরুণ বয়সে রামমোহন সে করুণ দৃশ্য দেখেছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এ বর্বর প্রথার উচ্ছেদ করবেনই। এবার এবিষয়ে হাত দিলেন রামমোহন। এই নিয়ে আবার গোড়া হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই সুরু হ'ল। রামমোহনের বিরোধিতা করবার জন্যে হিন্দুরাও একটি সভা সৃষ্টি করলেন। এর নাম হ'ল ধর্মসভা। ক'লকাতার বিশিষ্ট সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব হ'লেন সভাপতি। অনেক মাতব্বর ধনী হ'লেন এ সভার সভ্য।

সতীদাহের বিরুদ্ধে ইংরেজ অথবা ভারতীয় কেউই কিছু বলতে সাহস করতেন না সে-সব দিনে। এমন কি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক অনেক পাদ্রীসাহেবও এ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও রকম প্রচার করতেন না। রামমোহন এই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানালেন। শাস্ত্র খুলে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে সব ক্ষেত্রে সহমরণ বিধেয় নয়। স্বামী মারা গেলে যদি কোনো স্ত্রীর শিশুসন্তান থাকে অথবা তিনি অন্তঃসত্ত্বা থাকেন তা হলে তিনি সহমৃতা হবার যোগ্য নন। নাবালিকা স্ত্রীরও ঐ অবস্থা। আবার কোনো উৎকট ওষুধ অথবা মাদকদ্রব্য খাইয়ে যদি কোনো স্ত্রীকে সহমরণে উত্তেজিত করা হয়, তবে তাও সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার-বিরুদ্ধ।

তা' ছাড়া রামমোহন বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেন যে এই প্রথার পিছনে কোনও রকম পুণ্যলাভের উদ্দেশ্য নেই, আছে কেবল অন্যায়-ভাবে বিত্তলাভের অভিসন্ধি। কোনো নারীর পতি বিয়োগ হ'লে তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী যারা, তারা চেষ্টা করে যাতে ঐ বিধবা নারী সহমৃতা হন। তা' হলে সম্পত্তিটা হাতাতে আর দেরী হয় না, সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। তাই সমাজপতিরা দিয়ে দিল শাস্ত্রের দোহাই।

ব'লে দিল স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। রাম-মোহন এ ধাপ্পা ফাঁস ক'রে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন যে সহমরণের চেয়ে বিধবা নারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন বিধেয়।

তা না হয় হ'ল, সমাজপতিরা বললেন, কিন্তু এ যে এখন দেশাচার হয়ে গেছে। অশাস্ত্রীয়, ধর্মবিরুদ্ধ হ'লেও দেশাচার যখন তখন এ মানতে হবে।

তা হ'লে ত মানুষ খুন করা বা চুরি করাও পাপকাজ নয়। বংশ পরম্পরা যখন ও-কাজ হয়ে আসছে, তখন ও-ও তো দেশাচার হয়ে গেছে। আর ঐ একই কারণে বন্য বা পার্বত্য লোকেরা যে দস্যুবৃত্তি ক'রে বেড়ায় তাদেরও ত দোষ দেওয়া যায় না। তাদের দেশাচার পালন করে যখন তারা, তখন তাদের নিবৃত্ত করতে কখনই চেষ্টা করা উচিত নয়। কেন, এর বেলায় ঘাড় নাড়ছ কেন? তোমার যুক্তির ত এই ন্যায়সঙ্গত পরিণতি! তা নয়, আসল কথা কি জান? কোন ধর্মবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজই দেশাচার ব'লে কর্তব্য হতে পারে না। এ সব কাজে পাপ অর্শাবেই। যতই তর্ক করো, এ কথা ত মনে মনে স্বীকার করো যে সতীদাহই বলো, আর যাই বলো, এ নারী, হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়? ভাবের ঘরে চুরি কর কেন? কেন মনকে চোখ ঠারো?

কেবল কথোপকথন আর পুস্তক-প্রচারের দ্বারা সহমরণ প্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা লোককে বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না রামমোহন। মাঝে মাঝে তিনি চলে যেতেন কলকাতার গঙ্গাতীরে। সেখানে চেষ্টা করতেন নানান উপায়ে সহগামিনী রমণীর সহগমন বন্ধ করতে। এক-দিন রামমোহন খবর পেলেন যে বীরসিংহ মল্লিকের পরিবারের একটি স্ত্রীলোক সহমৃতা হবার জন্যে গঙ্গাতীরে এসেছেন। খবর পেয়েই রামমোহন হাজির হলেন সেখানে। এই হতভাগিনীর আত্মীয়দের নানাভাবে বুঝাতে লাগলেন যাতে সহমরণ বন্ধ হয়। কিন্তু কে

বোঝে তাঁর কথা ? শোনে কে ? অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন তাঁরা। একজন ক্রোধান্ধ হয়ে রামমোহনকে উদ্দেশ করে বললেন, "হিন্দুর কাজে মুসলমান কেন ?" আরও অনেক কটুবাক্য বর্ষিত হতে লাগল তাঁর প্রতি। রামমোহন কিন্তু এ অপমানে একটুও অসন্তুষ্ট হলেন না। শান্তভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন তাদের বোঝাবার। কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে তাঁর ভৃত্য ছিল। সে সহ্য করতে পারল না এ অপমান। উত্তেজিত হয়ে উঠল। রামমোহন আবার অনেক ক'রে তাকে শান্ত করলেন।

এই সময়ে একদিন ভারী মজা হয়। তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইনের সাহায্যে তুলে দেওয়া সম্বন্ধে রামমোহনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন ব'লে তাঁকে আনবার জন্যে তাঁর কাছে একজন এডিকং পাঠিয়ে দিলেন। এডিকং এসে সে কথা বললেন রামমোহনকে। রামমোহন বললেন, "আমি এখন ব্যস্ত আছি। আপনি দয়া ক'রে লাটসাহেবকে বলবেন যে রাজদরবারে যাবার আমার বড় ইচ্ছে নেই।" এডিকং সে কথা যথাযথ বেন্টিঙ্ক সাহেবকে জানালেন। বেন্টিঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন,"আপনি তাঁকে কি বলেছিলেন ?" এডিকং উত্তর দিলেন, "আমি বলেছিলাম যে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক আপনাকে ডাকছেন।" বেন্টিঙ্ক শুনে বললেন, "আপনি আর একবার তাঁর কাছে যান, গিয়ে বলুন যে মিষ্টার উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে আপনি দয়া ক'রে দেখা করলে তিনি বাধিত হবেন।" এডিকং আবার এসে রামমোহনকে সে কথা জানালেন। বেন্টিঙ্কের এতদূর আগ্রহ ও শিষ্টাচার দেখে রামমোহন খুশী হলেন। আর উপেক্ষা করতে পারলেন না এ আমন্ত্রণ।

রামমোহনের চেষ্টা অবশেষে সফল হল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে লর্ড বেন্টিঙ্ক এই সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করলেন। দেশের শত শত বিধবা নারী রামমোহনকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন।

কিন্তু ক্ষেপে গেল ধর্মসভা। রামমোহনের বিরুদ্ধে অজস্র গালাগালি দিতে লাগল। তাঁকে সমাজচ্যুত করল। মেরে ফেলার ভয়ও দেখাল কেউ কেউ। কিন্তু এ-সব কিছুই গ্রাহ্য করলেন না রামমোহন। সমাজ মানলে তবেই ত মানবেন সমাজের শাস্তি!

॥ সতেরো ॥

মনের আনন্দে কাজ চালিয়ে চললেন রামমোহন।* সমাজ সংস্কারের একটা উদ্যমে সফল হয়ে উৎসাহ বেড়ে গেল। এবার মেতে উঠলেন স্ত্রী-অধিকার নিয়ে। এ-দেশে মেয়েদের হীনবল জেনে সমাজ তা'দের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করলেন রামমোহন। দাবী করলেন তাদের জন্যে সমান অধিকার।

সমাজপতিরা আপত্তি তুললেন, বললেন, অধিকার? অধিকার কিসের? মেয়েদের কি বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে কিছু? না, আছে তাদের ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা?

কিন্তু দোষ যে দিলে, ওদের বুদ্ধির পরীক্ষা নিয়েছো কি কখনো? ওদের বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানলাভের সুযোগ দিয়েছো? সে সুযোগ দিয়ে যদি দ্যাখো যে ওরা ঠিকমত সব জিনিষ অনুভব বা গ্রহণ করতে পারছে না, তখন তা'দের অল্পবুদ্ধি ব'লো, আপত্তি করব না। কিন্তু তা'দের বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ না দিয়েই কেমন ক'রে জানলে যে ওরা বুদ্ধিহীন? অন্যদিকে আমাদের অতীত ইতিহাস দেখো। দেখো, লীলাবতী, ভাণুমতী, কর্ণাটরাজের স্ত্রী, কালিদাসের স্ত্রী প্রভৃতি যে-সব মহিলা বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন তাঁরা সকল শাস্ত্রেই গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রমাণ আছে যে অত্যন্ত দুরূহ যে ব্রহ্মজ্ঞান তা' ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়েছিলেন। মৈত্রেয়ীও সে উপদেশ গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হয়েছিলেন। তবে আজকের মেয়েদেরও যদি যোগ্যশিক্ষা এবং সমান সুযোগ দেওয়া যায়, তারাও যে বুদ্ধির পরিচয় দেবে না, এ কথা কে বলতে পারে?

এবার আপত্তি উঠল এই ব'লে যে মেয়েদের স্থৈর্য নেই। রাম-মোহন হেসে উঠলেন। বললেন, এ দেশের পুরুষ তোমরা, তোমরা মৃত্যুর নাম শুনলে আধ-মরা হ'য়ে যাও, আর তোমারই দেশের মেয়েরা

স্থিরভাবে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় অগ্নিপ্রবেশ করে। তবু বলবে মেয়েদের অস্থির মন? লজ্জা লাগে না বলতে?

কিন্তু মেয়েরা যে ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করে? রামমোহন বললেন, বেশ, বিচার কর। পুরুষ, মেয়ে—দু'দলেরই চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর। করলেই দেখতে পাবে যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে দশগুণেরও বেশী। তখন আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না।

যাক, তবে এ কথা ত' অস্বীকার করতে পারবে না যে মেয়েদের ধর্ম্মভয় অল্প?

না, ও কথাও অস্বীকার করি আমি। আমি বলি ঠিক তার উল্টো। বললেন, রামমোহন, দেখ, কত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তা'রা সংসারে পায়। কিন্তু সব হাসিমুখে সহ্য করে তারা, শুধু ধর্ম্মভয়ে। বিয়ের সময়ে নব-বধূকে আমরা অর্দ্ধ-অঙ্গ ব'লে স্বীকার করি। বলি, "তোমার হৃদয়, আমার হৃদয় এক অভিন্ন।" কিন্তু সংসারে তা'দের পশুর চেয়ে বেশী মর্যাদা দি' না। উদায়স্ত খাটাই সংসারে, কিন্তু এদিকে পান থেকে চুনটী খসলেই গঞ্জনা, তিরস্কার। বিনা বেতনে আজীবন তা'রা দাসীবৃত্তি ক'রে যায়। আবার এমন কুলীন ব্রাহ্মণও আছেন অনেক যাঁরা টাকার লোভে একসঙ্গে দশ-বিশটা বিয়ে ক'রে ফেলেন, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে হয় ত' জীবনে দেখাই করেন না। তবুও ত' স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না। মুখ বুজে সারাজীবন নিজের দুর্ভাগ্য বহন ক'রে যায়। এ সব দেখে শুনেও বলবে যে আমাদের দেশের মেয়েদের ধর্ম্মভয় অল্প?

॥ আঠার ॥

এবার বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন রামমোহন। বললেন, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা অশাস্ত্রীয়। আমি কুলীন ব'লে অথবা ধনী ব'লে, অর্থলোভে অথবা পশুবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে খুশীমত একের পর এক বিয়ে ক'রে চলব, সে চ'লবে না। শাস্ত্রে যে যে বিধান আছে এ সম্বন্ধে তা' খুলে দেখালেন। সেখানে আছে যে স্ত্রী যদি সুরাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষিণী, অথবা হিংস্র স্বভাবা হয়, তা' হ'লে সে স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামী আবার বিয়ে করতে পারেন। রোগগ্রস্তা, বন্ধ্যা, অথবা অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীর বেলাও এই এক ব্যবস্থা। আবার এ কথাও শাস্ত্রে আছে যে সচ্চরিত্রা, হিতকারিণী স্ত্রী যদি রুগ্না হয়, তা' হ'লে তা'র সম্মতি নিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবে। শাস্ত্রে খুশীর কথা লেখে নি, লেখে নি যে মনের আনন্দে যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে ক'রে যেতে পার।

আর একটা কথা চিন্তা করলেন রামমোহন। দেখলেন যে এই বহুবিবাহ প্রথার পিছনে রয়েছে আর একটি সমাজ ব্যবস্থা। বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ভার নিতে স্বামীকে বাধ্য করে না সমাজ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীরও কোনও অধিকার স্বীকার করে না। ফলে, দায়িত্ব যখন নেই তখন কর না যত খুশী বিয়ে! কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর অবস্থা হয় শোচনীয়। তা'র খাওয়া-পরার কোনও সংস্থান থাকে না। যদি বা ছেলে-বৌ দু'টো খেতে পরতে দেয়, খাটিয়ে নেয় তা'র দশগুণ। গঞ্জনারও সীমা থাকে না। আবার সতীনের ছেলে বা ছেলের বৌ-এর হাতে পড়লে এ দুর্দশা ত' শতগুণ বৃদ্ধি পায়। তাদের অত্যাচারে জীবন দুর্বহ হ'য়ে পড়ে। এই দুর্দশার কথা ভেবেও অনেক স্ত্রী মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণ করেন। তাই প্রতিবাদ জানালেন রামমোহন এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। দেখালেন যে ভুল টীকার ফলে স্ত্রীজাতির

এই দুর্দশা হয়েছে। না হ'লে মূল শাস্ত্র যদি মানো, তবে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হ'বে স্ত্রীকে। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেককে স্বামীর সম্পত্তির অংশ দিতে হবে। এতে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আসায় বহু-বিবাহ প্রথাও বন্ধ হবে খানিকটা। আবার স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী একেবারে অসহায় হ'য়ে পড়বেন না ব'লে সহমরণের সংখ্যাও কমে যাবে অনেক।

আর একটা সংস্কারকাজে হাত দিলেন রামমোহন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন। তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করলেন যে এ প্রথা ভারতবর্ষের অশেষ অনিষ্টের মূল। তাই মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের লেখা সংস্কৃত বই 'বজ্রসূচি' বাংলায় অনুবাদ করলেন। বজ্রসূচি গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে জাতিভেদ প্রথার অত্যন্ত নিন্দা করেছেন।

॥ উনিশ ॥

রামমোহন যখন আত্মীয় সভা স্থাপন করেছিলেন তখনই ডেভিড হেয়ার নামে একজন ইংরেজ ঘড়িওয়ালার সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'য়েছিল। আলাপ থেকে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হ'ল, এ শুধু দু' দিনের সহৃদয়তা নয়, এ আত্মীয়তা আমরণ স্থায়ী হয়েছিল। আর না হ'য়েই বা উপায় কি? সব কথা ছেড়ে দিলেও মাগুর মাছের স্বাদ ত' সাহেব ভুলতে পারেন না। এ অমৃতের স্বাদ গ্রহণ ক'রতে তাঁকে প্রথম শিখিয়েছিলেন রামমোহন। এ হেন গুরুর সঙ্গ কি ছাড়া যায় কখনো, না ছেঁড়া যায় তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র।

এই ডেভিড হেয়ার এবং স্যার এড্‌ওয়ার্ড হাইড্ ইস্টের সাহায্যে রামমোহন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের জন্যে উঠে প'ড়ে লাগলেন। কিছুদিন ধ'রেই ইংরেজরা মহাদ্বিধায় পড়েছিলেন। দেশে যে শিক্ষার প্রসার দরকার সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন সরকার? ইংরেজী শিক্ষা, না, সংস্কৃত শিক্ষা? এ এক মহা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে রামমোহন একখানি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি ইংরেজীশিক্ষার সমর্থন করলেন। দেখালেন যে দু' হাজার বছরের পুরানো জ্ঞানে বর্তমান যুগে কারুরই কোনও লাভ হবে না। না হবে বিদ্যার্থীর, না হবে সমাজের। কুসংস্কার বিনাশ ও সামাজিক উন্নতির জন্য এখন দরকার পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান। আর তার জন্যে ইংরেজী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

অবশেষে তাঁর চেষ্টা সফল হ'ল। ডেভিড হেয়ার, স্যার এড্‌ওয়ার্ড হাইড্ ইস্ট এবং রামমোহনের সম্মিলিত যত্নে হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হ'ল। রামমোহন এই কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সভ্য হ'লেন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দু যাঁরা তাঁরা এতে আপত্তি করলেন। বললেন, রামমোহন যদি এ সমিতির সভ্য থাকেন, তবে আমরা থাকবো

না এর মধ্যে। করব না সহযোগিতা। রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে সভ্যপদ ত্যাগ করলেন। ' বললেন, "আমি কমিটিতে থাকলে যদি কলেজের অনিষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে, তবে আমি এ সম্মানের জন্য একটুও লালায়িত নই।" কমিটি থেকে বেরিয়ে এলেন রামমোহন।

॥ কুড়ি ॥

ধর্ম হ'ল, সমাজ-সংস্কার হ'ল, এবার রাজনীতি আরম্ভ করলেন রামমোহন। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে তিনি বিরোধ দেখতে পেলেন না। ছোটবেলা থেকেই রাজনৈতিক ভাব তাঁর প্রবল ছিল। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই বিদেশীয় অধিকারের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাবশতঃ তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন লামাদের দেশে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তাঁর এ বিদ্বেষ বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। ক্রমশঃ তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারতবর্ষের যে-অবস্থা তাতে ইংরেজ-শাসন দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে। তাই এ-বিষয়ে নিজের মত প্রচার করলেন রামমোহন। আবার ইংরেজ-শাসনের মন্দ দিক যা ছিল তা'র বিরুদ্ধেও আন্দোলন তুললেন তিনি।

রামমোহনকে ভারতবর্ষের অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলা যেতে পারে। ইউরোপীয় রাজনীতির প্রবর্তক ছিলেন গ্রীক-মনীষী অ্যারিস্টটল। ভারতীয় রাজনীতির পিতা রাজর্ষি রামমোহন! খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী, আচার্য্য শঙ্কর থেকে বলদেব বিদ্যাভূষণ,—এঁদের সকলেই দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি কেউ। তা'র কারণও ছিল বৈ কি। যে দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব'লে কিছু নেই, জনমত ব'লতে কিছু আছে কি না সন্দেহ, আর রাজনীতিতে যেখানে কেবল রাজার অধিকার, সে দেশে রাজনীতির চর্চা কখনই সম্ভব নয়। মধ্যযুগে রাজপুত ও মুসলমানদের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা হয়েছিল ঠিক এই রকম।

রামমোহন দেখলেন যে সবচেয়ে আগে যা' প্রয়োজন, তা' হচ্ছে দেশের লোকদের রাজনৈতিক জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করা। তাই ১৮২১ সালে "সংবাদ কৌমুদী" নাম দিয়ে তিনি একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করলেন। দাবী করলেন ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে ন্যূনতম রাজনৈতিক অধিকার। এ কাজে তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামনাথ ঠাকুর,

কালীনাথ রায়, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, এগিয়ে এলেন। সাহায্য করলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব আর তারাচাঁদ চক্রবর্তী। একলা চলতে হ'ল না এ পথে। বন্ধু-গোষ্ঠী নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে চললেন রামমোহন।

আজ সব দেশেই সবাই স্বীকার করেন যে জাতির মঙ্গলের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষেও আমরা এ নিয়ে নাচানাচি করি। কিন্তু হয় ত' ভুলে যাই যে রামমোহন ও লর্ড মেট্‌কাফের চেষ্টাতেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে। ১৮২২ খৃস্টাব্দে ক্যালকাটা জার্নাল নামে একটি পত্রিকা সরকারের কোনো কাজের সমালোচনা করেন। ফলে, ঐ পত্রিকার সম্পাদক বাকিংহাম সাহেব সরকারের আদেশ পেলেন যে দু' মাসের মধ্যে তাঁকে ভারতবর্ষ ছেড়ে বিলেত ফিরে যেতে হবে। পত্রিকা প্রকাশও বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল সরকারী আদেশে। পরের বছর সহকারী সম্পাদককেও ধ'রে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এতেও ক্ষান্ত হ'লেন না সরকার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ ক'রে গভর্ণর জেনারেল একটি আইন পাশ করলেন। এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিল অবধি লড়লেন রামমোহন, কিন্তু তখনকার মত সফল হ'তে পারলেন না। তাঁর উদ্যম সফল হ'ল ১৮৩৫ সালে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারত সরকার স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু তার আগেই রামমোহন সেই দেশে চ'লে গেছেন যেখান থেকে কেউ আর কোনদিন ফিরে আসে না।

রামমোহনের সময়ে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবু ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এবং দেশের প্রাচীন সাহিত্যে দখল থাকার দরুণ রামমোহন ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর অভ্যুদয় সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। তাঁর মতে খৃস্টের আবির্ভাবের দু'হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত

ছিল। তখন আইন করতেন ব্রাহ্মণরা আর দেশ শাসনের ভার ছিল ক্ষত্রিয়দের ওপর। খুসী মতন আইন করা হ'ত না, জনমত অনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা হ'ত। ক্ষত্রিয়রা যদি স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে পড়ত, তখন ব্রাহ্মণরা তাদের দমন করতেন। সে ক্ষমতা, সে অধিকার তখন ছিল ব্রাহ্মণদের। কিন্তু যখন থেকে ব্রাহ্মণরা রাজার অধীনে কাজ নিতে আরম্ভ করলেন, তখন থেকে তাঁদের এই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য আর রইল না, রইল না রাজাকে দমন করার দাপট। এইভাবে দেশ শাসন করা এবং আইন করা—এই তু' কাজেরই ভার পড়ল এক রাজার হাতে, আর দেশে স্বেচ্ছাচার প্রবর্তিত হ'তেও দেরী লাগল না। প্রায় হাজার বছর ধ'রে রাজপুতরা দেশের ওপর অত্যাচার করল। তারপর দেশের ছোট রাজাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও দলাদলির সুযোগ নিয়ে, মুসলমানরা এ দেশ অধিকার করল। তারা দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সব ধ্বংস করে দিল। তারপর এল ইংরেজ রাজত্ব। রামমোহন দেশের লোকের তুর্বলতার কথা জানতেন। বুঝলেন, ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের পক্ষে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও বিশেষ দরকার। তাই ব'সে ব'সে আকাশ-কুসুম রচনা না ক'রে, একেবারে 'ইংরেজ তাড়াও' আন্দোলন না এনে, তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন দেশে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে এবং দেশের লোক যে যে অধিকার পাবার যোগ্য সেই সেই অধিকার দাবী করতে। তারপর তারা যতই যোগ্য হবে, ততই এ দাবী বাড়িয়ে চললেই হবে।

॥ একুশ ॥

ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কুই ১৭৪৮ সালে একখানি বই লিখেছিলেন। বইখানি চারদিকে খুব হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। এতে তিনি লিখে-ছিলেন যে প্রত্যেক রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে যে তিনটি ক্ষমতা আছে—আইন করার ক্ষমতা, দেশ শাসন করার ক্ষমতা এবং বিচার করার ক্ষমতা—তা'র প্রত্যেকটি ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে থাকা প্রয়োজন। আবার যাঁদের হাতে এই ক্ষমতা থাকবে তাঁদের প্রত্যেকেরই থাকা চাই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সত্তা। তা' না হ'লেই দেশে স্বেচ্ছাচার দেখা দেবে, প্রজারা হ'য়ে উঠবে অত্যাচারে জর্জরিত। আর দেশ যা'তে ঠিক ঠিক আইন মত শাসন করা হয়, সে-দিকেও নজর রাখতে হবে। এ-সব কথা খুব মনে লাগল রামমোহনের। তিনিও ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করবার জন্যে দাবী জানালেন। তিনি বললেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশের শাসক; তাই কোম্পানীর হাতে আইন করার ভার কিছুতেই থাকতে পারে না। সে ভার গ্রহণ করা উচিত সপরিষদ রাজার। তা' না হ'লে কোম্পানীর হাতে সব ক্ষমতা এসে স্বেচ্ছাচারের প্রবর্তন হবে আবার। দেশবাসীর জীবন অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠবে।

মানুষের জন্মগত অধিকারের কথা রামমোহন মানতেন না। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে ইংরেজ মনীষী বেন্থামের প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। সমাজ-সংস্কার বিষয়েও এঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। সব সংস্কারের পিছনেই তিনি দেখতেন যে এতে সবচেয়ে বেশী লোকের হিতসাধন হবে কি না। যদি তা হয় তবে দেখতে হবে না কোনো প্রথা হাজার দু' হাজার বছর আগে উৎপন্ন হয়েছে কি না। যত পুরোনই হোক, সে-প্রথার সংস্কার করতে হবে। রামমোহন বললেন যে দেশাচার বা অনেকদিন ধরে হয়ে আসছে ব'লেই ত আর কোনো অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারো না। নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা কোনো দেশে অনেক-

দিন ধরে হয়ে আসছে ব'লেই ত আর সে পুণ্য কাজ নয়। এ সব পাশবিক কাজ যদি পৃথিবীর সব দেশ একসঙ্গে করে তবুও এ নিন্দনীয়, তবুও বন্ধ করতে হবে এ কাজ। কেন-না এ কাজ বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই ক্ষতিকর।

আবার এই নীতি অনুসরণ ক'রেই রামমোহন লিখলেন যে দেশবাসীদের সব সময়ে কর্তব্য শাসককে দেশশাসনে সাহায্য করা। কিন্তু যদি এমন হয় যে বর্তমান শাসকের বিরোধিতা ক'রে এমন একটি শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায় দেশে যাতে দেশবাসীর মঙ্গল হবে, তবে সে বিরোধিতা করা ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু মতের মিল হ'ল না বেন্থামের সঙ্গে অন্য এক বিষয়ে। বেন্থাম বললেন যে মানুষের জাতিগত বা কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা'র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন নির্ধারিত হয়, এ কথা অর্থহীন। সব মানুষেরই প্রয়োজন এক। রামমোহন সায় দিতে পারলেন না এ কথায়। বললেন, বড় বড় কথায় ত' লাভ নেই কিছু, লাভ নেই ভাববিলাসে। এ কথা ত' অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষের জন্যে যদি আজ কোনো আইন তৈরী করতে হয়, তবে তা' করতে হবে দেশের আইন এবং আচারের সঙ্গে সঙ্গতি এবং দেশবাসীর ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

আর একটি বিষয়ে রামমোহন অদ্ভুত আলোকপাত করলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আইনশাস্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে দু'টি দলে রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। এক দল হ'লেন 'এ্যানালিটিক্যাল' বা বিশ্লেষণকারী দল। অস্টিন ছিলেন এই দলের মাতব্বর। আর একটি 'হিস্টোরিক্যাল' বা ঐতিহাসিক দল। স্যাভিগ্‌নি এবং স্যার হেন্‌রী মেইন ছিলেন এ দলের পাণ্ডা। প্রথম দল বললেন, আইন যে আমরা মানি তা' কেবল আমাদের কর্তাদের হুকুম বলেই মানি। অপর দল লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, না, তা' কখনই না। আমাদের আচার-

অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, আইনের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় ব'লে আমরা আইন মানি। এমন আইন কি কোনো রাজা করতে যাবেন যে আইন দেশবাসীর আচার বা নীতির বিরোধী? না, করলেই দেশবাসী তা' মানবে যেহেতু রাজার আদেশ? এইভাবে চলল তর্কবিতর্ক। রামমোহন কিন্তু এ-সব বাগ্‌বিতণ্ডার কোন খবরই রাখতেন না। তবু ১৮৩০ সালে তিনি একখানি বই যা' লিখলেন তা এই দু'টো দলেরই সারকথা। তিনি বললেন যে ইতিহাসের দিক দিয়ে হয় ত' কোনো আইন প্রথম তৈরী হবার সময়ে তার পেছনে থাকে জনমত অথবা রাজার আদেশ। কিন্তু সে-আইন টিকে থাকতে গেলে তা' এমন হওয়া চাই যা লোকে মানবে; তার পেছনে থাকা চাই জনমতের সমর্থন। আবার অন্য দিক দিয়ে চিন্তা করলে, প্রতিটি আইন বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তা হচ্ছে রাজার আদেশ। কারণ আইন ত সত্যিকারের তখনই কার্যকরী হয় যখন রাজা তাঁর বিচারালয়গুলির মারফত সেই আইনটি মেনে নেন। এই স্থির বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বিচার রামমোহন অস্টিন, স্যাভিগ্‌নি ও মেইনের আগেই লাভ করেছিলেন।

আর এক কথা বললেন রামমোহন। তিনি স্বীকার করলেন যে দেশের যে-কোনও আইন-কানুন পরিবর্তন করার অধিকার শাসকের আছে। কিন্তু এ দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দেশের বহুদিনের পুরানো রীতি-নীতি একচোটে উল্টে দেওয়া না হয়। সেগুলো মোটামোটি শাসকের মানাই উচিত। তাই ব'লে কি সব দেশাচারই মানতে হবে, অনেকদিন ধরে চলে আসছে ব'লে? কখনই নয়। শুধু সেগুলি মানলেই হবে যে-গুলি ন্যায়সঙ্গত এবং যে-গুলি জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর। যে-সব দেশাচার এ নীতির বিপরীত তা একটুও দ্বিধা না করে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

আইন এবং নৈতিকতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম তফাতটি তা বিশ্লেষণ করে দেখালেন রামমোহন। এ বিশ্লেষণ তাঁর পরে ইংরেজ মনীষী অস্টিন

করেছেন এবং অস্টিনকে নিয়েই আমরা মাতমাতি করি এ-দিক দিয়ে। কিন্তু অস্টিনের আগে যে মনীষী স্পষ্ট ভাষায় এ-কথা লিখে গেলেন তাঁকে আমরা মনেও করি না, অনেক সময় জানিও না তাঁর দানের কথা। রামমোহন দেখালেন যে সংসারের কর্তা যদি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি ছেলেদের সঙ্গে যুক্তি না ক'রেই বেচে দেন, তবে নীতির দিক দিয়ে এ নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। কারণ এতে সে সংসারের অন্য লোকেরা অসহায় হ'য়ে পড়বে, হয় ত' তাদের খাওয়া-পরার কোনও সংস্থানই থাকবে না। কিন্তু এ ভাবে বেচবার আইনসঙ্গত অধিকার যে কর্তার আছে সে-কথা ত' অস্বীকার করা যায় না! মানে, আসল কথা হচ্ছে যে কিছু কিছু নীতিগত আইন রাস্ট্রের তৈরী বিধি-ব্যবস্থার মধ্যেও স্থান পায়, আবার রাজার তৈরী অনেক আইনও হয় ত' নীতিসঙ্গত হয়ে যায়। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নীতিসঙ্গত এবং নীতি-বিগর্হিত—এ দু'রকম আইন মানতে হয়, এবং মানা উচিতও—সেখানে কোনো ওজর-আপত্তি তুললে চলবে না, খাটবে না কোনো জারিজুরি।

এর উত্তরে এক ভদ্রলোক রামমোহনকে একখানা চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি বললেন যে কোনো কর্তা যদি স্থাবর কোনো পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রী করেন, তবে সে বিক্রী আইনসিদ্ধ হবে না। কারণ, নীতির দিক দিয়ে যা সমর্থন করা যায় না, আইনের দিক দিয়েও তা হবে অসিদ্ধ।

রামমোহন ভদ্রলোকের ভুল ভেঙ্গে দিলেন। বললেন, সায় দিতে পারলুম না তোমার কথায়। মদের কথাই ধর। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এমন ক্ষতিকর জিনিষ ত আর দুটি নেই। কিন্তু তবু সরকারকে কর দিলে মদ বিক্রী আইনের দিক দিয়ে ত' একটুও অন্যায় হ'বে না। অথচ এও ত' ঠিক যে একাজ নীতি-বিগর্হিত। তাই ব'লে কি কেউ বলবে যে মদের ওপর সরকার যে কর বসিয়েছেন তা' নীতি-সঙ্গত নয় ব'লে আইন-সঙ্গতও নয়, এবং তাই বন্ধ ক'রে দাও কর-দেওয়া?

তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং হিংস্রপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে যখন যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাজিত ক'রে যখন তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করো, সে ত' অত্যন্ত অধর্ম কাজ। তাই ব'লে কি যুদ্ধশেষে সেই লুণ্ঠিত জিনিষ ফিরিয়ে দাও তা'র মালিককে? অযোগ্য পাত্রের হাতে যখন মেয়ে দাও, সে ত' নীতির দিক দিয়ে সমর্থন করো না। সে-জন্য কি সেই দম্পতির সন্তান-সন্ততিদের অবৈধ বলবে? কাজেই ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলেই দেখতে পাবে যে আইন ও নীতি সব সময়ে হাতে হাত দিয়ে চলে না। তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

॥ বাইশ ॥

এবার দেখা যাক্ ভারতের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে রামমোহন কি ব'লেছেন। তিনি বললেন যে সরকারকে যে-কোনও আইন করবার আগে প্রস্তাবিত আইনটি ছাপাতে হবে এবং তার কপি শুধু দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদেরই পাঠালে চলবে না, তা' পাঠাতে হ'বে দেশের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের কাছেও। তাঁর মতে কোনো আইন তৈরী করতে গেলে তা'র প্রস্তাব আসবে ভারত সরকারের কাছ থেকে, সে প্রস্তাবটি সমালোচনা করবেন ভারতীয় জনসাধারণ এবং ভারতস্থিত সরকারী কর্মচারীরা, আর আইন পাশ করবার দায়িত্ব থাকবে বৃটিশ পার্লামেন্টের ওপর।

১৮৩২ সালে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে যে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, তাঁদের কাছে অনেকে অনেক প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কেঁউ কেউ বললেন যে, সুপ্রীম কোর্টের জজদের ভারতীয় আইনসংসদের সভ্য ক'রে নেওয়া হ'ক। রামমোহন কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন যে, এ-প্রস্তাব গ্রাহ্য হ'তে পারে না কারণ তা' হ'লে আইন করবার ক্ষমতা এবং বিচার করবার ক্ষমতা এক হাতে এসে পড়বে এবং তা'তে ক'রে স্বেচ্ছাচারের প্রবর্তন হবে।

কোম্পানীর আমলে দেশে বিচারবিভাগের বড় একটা সুনাম ছিল না। রামমোহন এই বিভাগের উন্নতির জন্যে কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করলেন! তিনি বললেন, যা'তে বিচারবিভাগে সততা থাকে তা'র জন্য জনসাধারণের কাছে বিচারকক্ষের দ্বার খোলা রাখতে হবে। বিচারের সময় তা'রা আসবে, আইন অনুসারে ঠিক ঠিক বিচার হচ্ছে কি না তা' দেখবে, বিচারে কোনো গল্তি থাকলে তা' কাগজে প্রকাশ ক'রে সকলকে জানিয়ে দেবে। অবশ্য এ কথাও সত্যি যে এ অধিকারের অপপ্রয়োগ করবে দুষ্টলোকেরা, মিথ্যে মিথ্যে ক'রে

অনেক খবর ছাপাবে। তা'র জন্যে ব্যবস্থা রাখতে হবে যে, মিথ্যা খবর দিয়েছে কেউ প্রমাণিত হ'লে তার কড়া শাস্তি দিতে হবে।

আর একটা অসুবিধা এই যে বিদেশী বিচারকরা এ দেশের ভাষা জানেন না, জজদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম, আর সবার ওপরে আছে বাদী-বিবাদীর জাল-জোচ্চুরিতে অসাধারণ পারদর্শিতা। রামমোহন ব'ললেন, পঞ্চায়েত প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করলে এ সব অসুবিধা দূর হবে। কিন্তু তাই ব'লে বাংলাদেশে যে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল সে প্রথার পুনঃপ্রবর্তন নয়। পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা রামমোহনের যথেষ্ট ছিল। সেখানের পঞ্চায়েত যে নিরপেক্ষ বিচার করে না, ক্ষমতাবান এবং ঐশ্বর্য্যশালীর পক্ষে রায় দেয়, সাক্ষীকে বিচারের সময়ে হাজির করবার যে ক্ষমতা নেই তা'দের, এ কথা রামমোহন জানতেন। তা' ছাড়া এ সব পঞ্চায়েত ঠিকমত বস্‌তোও না। তাই এ পঞ্চায়েত প্রথা বাতিল ক'রে দিলেন তিনি। তিনি দাবী জানালেন, জুরীর সাহায্যে বিচার করতে হবে। প্রত্যেক জায়গার জজসাহেব জুরী হিসেবে কাজ করবার যোগ্য গণ্যমান্য দেশীয় লোকদের নিয়ে একটি লিস্ট্ তৈরী করবেন। তা'র মধ্যে থেকে যে ক'জন জুরী সত্যিকার বিচারের সময়ে নেওয়া হবে, তা'র তিনগুণ নাম বেছে নেওয়া হবে এবং তা'দের সমন পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনা হবে। তারপর বিচারের সময়ে তাদের মধ্যে থেকে লটারী ক'রে প্রয়োজনমত লোককে ডেকে নেওয়া হবে জুরী হিসাবে কাজ করবার জন্য। এতে লাভ হবে এই যে, বিচার আরম্ভ হ'বার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত কেউ—এমন কি জজসাহেবও, জানতে পারবেন না সত্যিকার জুরীদের নাম। তিনজন, পাঁচজন, বা আরও বেশী জুরী নিয়ে বিচার করা যেতে পারে। তবে একটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জুরীরা যাতে বিচার-পদ্ধতি বুঝতে পারে তা'র জন্য বাংলায় কোর্টের কাজ চালাতে হবে। আর বিচারক হিসাবে একসঙ্গে দু'জন লোক রাখতে হবে। একজন ইংরেজ জজ থাকবেন আইন ও

শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য, আর একজন থাকবেন ভারতীয় জজ। তিনি দেখবেন যা'তে কেউ ধরা-করা, ঘুষ-ঘাস দিয়ে কাজ হাসিল ক'রে না নেয়। যদি জজসাহেব এবং জুরী একমত হ'য়ে কোনো রায় দেন, তবে তা'র বিরুদ্ধে আর আপীল করা চলবে না। অন্যথায় ওপর আদালতে পরাজিত পক্ষ আপীল করতে পাবে। কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা। তাঁরা বললেন যে, দেশীয় লোকদের যদি জুরী হ'বার অধিকার দেওয়া হয়, তা হ'লে এমনও ত' হ'তে পারে যে কোনো ইংরেজ অপরাধীর বিচারের সময়ে তারা জুরী হ'য়ে বসল। কিন্তু সে ত' অত্যন্ত অন্যায় হবে। এর বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করলেন রামমোহন। বললেন, রাজা প্রজাদের মধ্যে আবার ভেদাভেদ করেন, এ ত' শুনি নি কখনও। রাজার কাছে সব প্রজাই সমান। যে যোগ্য হবে, সে কতগুলি বিশেষ অধিকার পাবে। এর মধ্যে আবার ভারতীয়, ইংরেজ এই সব কথা তুলে দলাদলি আনছো কেন? দেশীয় লোকেরা যদি যথেষ্ট জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান হয়, যদি জুরী হিসেবে কাজ করবার যোগ্য হয় তা'রা, তবে শুধু দেশীয় ব'লেই কেন তা'রা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? কেন পাবে না তারা তা'দের ন্যায্য অধিকার?

বিলাতের বিচার-ব্যবস্থা দেখে রামমোহন মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, তাই সেখান থেকে একটি প্রথা ভারতবর্ষে আমদানী করতে চাইলেন। শাসক যে ইচ্ছে করলেই যা'কে খুশী বেঁধে এনে হাজতে পুরে রেখে দেবে, তা' চলবে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা তা' হ'লে থাকবে না একটুও। পুলিশ কাউকে ধ'রে এনে জেলে পুরে রেখে দিলে, ধৃত ব্যক্তির কি কোনো উপায় থাকবে না সুবিচার পাবার? রামমোহন বললেন, না, থাকবে, নিশ্চয় থাকবে ব্যবস্থা। সদর দেওয়ানী আদালতের জজদের ক্ষমতা দেওয়া থাকবে যে এ সব ক্ষেত্রে তাঁরা পুলিশের ওপর পরওনা জারী করতে পারবেন অপরাধীকে তাঁদের সামনে হাজির করবার জন্য।

ইংরাজীতে এই পরওয়ানাকে বলে Writ of Habeas Corpus (রিট্ অফ্ হেবিয়াস্ করপাস্)। মফস্বলের লোকদেরও এই সুবিধা দেওয়ার জন্য রামমোহন প্রস্তাব করলেন যে এ-সব ক্ষেত্রে তদন্ত ক'রে সদর দেওয়ানী আদালতে রিপোর্ট পাঠাবার জন্যে ভ্রাম্যমাণ জজদের একজনকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া থাকবে।

আর একটি প্রস্তাব করলেন রামমোহন। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী তা'র কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে। বিচার ক'রে যদি দেখা যায় তা'র অন্যায় হয়েছে, তবে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। জজেরা এদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। আর মোকদ্দমা করবার জন্যে লোকেদের যা'তে অনেক দূরে গিয়ে অসুবিধা ভোগ করতে না হয় তা'র জন্যে খানিকটা দূরে দূরেই সদর আমীনদের অফিস করতে হবে। আর বিচারক এবং বিচারবিভাগীয় লোকেরা, যাঁদের সততার ওপর সমস্ত বিচার নির্ভর করে, তাঁরা যা'তে সৎ থাকতে পারেন তা'র জন্য তাঁদের যথেষ্ট মাইনে দিতে হ'বে এবং ঐ একই কারণে সাহেব জজদেরও মাইনে কমানো যাবে না।

॥ তেইশ ॥

শুধু দেশের রাজনীতির মধ্যেই রামমোহন নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁর একান্ত সহানুভূতি ছিল। ইংরেজী কাগজ তিনি নিয়মিত পড়তেন, খবর নিতেন ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা। কোনো দেশে ন্যায় ও সত্যের জয় হ'য়েছে শুনলে তাঁর আনন্দ আর ধরত না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলি যেদিন স্পেনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেলে, সেদিন ভারতবর্ষে এই একটি মানুষই নিজের পয়সা খরচ ক'রে ক'লকাতা টাউন হলে একটি প্রকাশ্য ভোজ দিয়ে সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। পর্তুগাল দেশেও যখন নিয়মতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল, রামমোহনের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। সে সময় তুরস্ক ও গ্রীসদেশের মধ্যে খুব ঝগড়া চ'লছিল। রামমোহন একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করতেন যা'তে গ্রীকরা তুরস্কবাসীদের অধীনতা ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়। ১৮২১ সালে যখন নেপল্‌সের স্বাধীনতা লড়াই-য়ের গলাটিপে ধরল অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা, তখন দুঃখে, ক্ষোভে, রামমোহন এক বন্ধুকে লিখলেন, "এ অবস্থায় আমি, নেপল্‌সবাসীদের দাবী আমার নিজের দাবী ব'লে মনে করি, তা'দের শত্রুদের মনে করি নিজের শত্রু ব'লে। স্বাধীনতার যা'রা বিরোধী এবং অত্যাচারীর যা'রা বন্ধু, তা'রা কোনো কালে সফল হয় নি, কোনো যুগে সফল হবে না।"

আবার ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব যখন সফল হ'ল, তখনও তিনি যারপরনাই আহ্লাদিত হ'লেন। এ দেশে ফরাসী বিপ্লবকে তিনিই সবচেয়ে বেশী অভ্যর্থনা জানালেন। ফরাসী দেশের প্রতি তাঁর এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে বিলাত যাবার সময়ে নেটাল বন্দরে তিনি একখানি ফরাসী জাহাজ দেখতে পেয়ে সেই জাহাজে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল ফরাসী জাহাজে। ফরাসীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল আন্তরিকতার সঙ্গে। তিনিও তা'দের অভিনন্দিত

করলেন। কিন্তু আত্মহারা হ'য়ে প'ড়লেন সেই জাহাজের ওপরে স্বাধীনতার নিশান উড়ছে দেখে। তাড়াহুড়ো ক'রে অভিবাদন জানাতে গেলেন সেই ফরাসী পতাকাকে। কিন্তু টাল সামলাতে পারলেন না। হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর পা ভেঙ্গে গেল। তা'তে একটুও দুঃখিত হ'লেন না রামমোহন। ভাঙ্গুক পা, তবু ত' স্বাধীনতার পতাকাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পেরেছেন, দাঁড়াতে পেরেছেন একটা স্বাধীন দেশের জাহাজের পাটাতনের ওপর।

আসল কথা, রামমোহনের রাজনৈতিক নীতিই ছিল আলাদা। তাঁর সময়ে সেই সবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগছে। একটা নতুন ধর্মের উদ্ভব হ'চ্ছে—নিজের দেশকে ভালবাস, দেশমাতৃকার সেবা কর। কিন্তু তখনও এ বোধ জাগে নি যে দেশকে ভালবেসেও অন্য দেশকে ভালবাসা যায়, অপর দেশের শত্রুতা না ক'রে সেবা করা যায় নিজের জাতের। রামমোহন শুনিয়েছিঁলেন এই বিশ্ব মৈত্রীর বাণী। আন্তর্জাতিকতার নীতি এ যুগে তিনিই প্রথম প্রচার করলেন। তাঁর পর ইংরাজ মনীষী গ্রীণ এবং হব্‌হাউজ এ নীতির কথা ব'লেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা যে আজ এঁদেরই আমরা মনে রেখেছি, ভুলে গেছি রামমোহনের দান! রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যদি স্বাধীনতা কায়েম হয় তবে সে আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছাবে। তাই পৃথিবীর সব দেশের রাজনীতিতেই ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ।

॥ চব্বিশ ॥

রামমোহনের জীবনের ছোটখাট ঘটনাও বেশ হৃদয়গ্রাহী। তা থেকে বোঝা যায় তাঁর বাক্‌পটুতা, উপস্থিতবুদ্ধি প্রভৃতি কি অপরিসীম ছিল।

একদিন তাঁর বাগানে এক ব্রাহ্মণ পূজোর জন্যে ফুল তুলতে এসেছেন। একটি গাছের ডালে নিজের চাদরখানি রেখে নিশ্চিন্তমনে ফুল তুলছেন ব্রাহ্মণ। রামমোহন একটা ইঙ্গিত করলেন ভৃত্যদের। তা'রা গোপনে চুরি ক'রে নিয়ে গেল ব্রাহ্মণের চাদর। ফুল তোলা শেষ হ'লে চাদর না পেয়ে ব্রাহ্মণ ত' রেগেই আগুন। চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার ক'রে তুললেন। রামমোহন গণ্ডগোল শুনে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে ঠাকুর ?" ব্রাহ্মণ বললেন সব কথা। রামমোহন আবার ইঙ্গিত করলেন চাকরদের চাদর ফিরিয়ে দেবার জন্য। ব্রাহ্মণ ফিরে পেলেন তাঁর চাদর। রামমোহন জিজ্ঞেস করলেন ব্রাহ্মণকে, "সন্তুষ্ট হয়েছেন ত' ঠাকুর ?"

—"আমার জিনিষ আমি পেলাম তা'তে আবার সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কি ?" খেঁকিয়ে উঠলেন ব্রাহ্মণ।

—"এ ফুলগুলি যে ঠাকুর কষ্ট ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন তুলে, এগুলো কার ?"

—"কেন ? দেবতার ফুল।"

—"দেবেন কাকে ?"

—"দেবতাকে দেব।"

—"কেন দেবতাকে দেবেন ?"

—"দেবতা সন্তুষ্ট হবেন।"

এইবার চেপে ধরলেন রামমোহন, "তা' কি হয় ঠাকুর ? তোমার চাদর তুমি পেয়ে যদি সন্তুষ্ট না হও, তবে দেবতার ফুল দেবতা পেয়েই বা সন্তুষ্ট হ'বেন কি ক'রে ? সন্তুষ্ট হ'বেন কেন ?" আর মুখে রা-টি নেই ব্রাহ্মণের—একেবারে চুপ।

আর একদিন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন রামমোহনের বাড়ীতে। দেবেন্দ্রনাথ তখন বালক, রামমোহনের ছেলের সহপাঠী। বাড়ীতে বাগানে একটি দোলনা টাঙানো ছিল, রামমোহন জিজ্ঞেস করলেন দেবেন্দ্রনাথকে, দোলনায় দুলবে? সম্পূর্ণ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল বালক। কিন্তু ব'লে দিলেন রামমোহন, তোমার দোলা শেষ হ'লে আমাকে দোল দিতে হবে, পারবে? তাতেও রাজী দেবেন্দ্রনাথ। তখন দুজনে মিলে বাগানে গিয়ে দুলতে আরম্ভ করলেন। একবার দেবেন্দ্রনাথ বসেন, দোল দেন রামমোহন। তারপর আবার রামমোহন চেপে বসেন দোলনায়, এবার দোলা দেবার পালা দেবেন্দ্রনাথের। এই রকম রামমোহন তখন দুলছেন, এমন সময়ে এক পণ্ডিত এসে হাজির হ'লেন বাগানে। দেখে ত' তিনি তাজ্জব! কি ব্যাপার? আবার খোকা হ'য়ে গেলেন নাকি রামমোহন? জিজ্ঞেস করলেন তিনি, এ কী ছেলেমানুষি আপনার? রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। বললেন, কি জানেন? বিলাত যাবো ঠিক করেছি। তা' জাহাজে ক'রে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে গেলে ত' এইরকমই দোল খেতে হবে। তাই আগে থেকেই অভ্যেস ক'রে রাখছি। পণ্ডিত ত' শুনে উচ্চহাসিতে ফেটে পড়লেন। এমনই উপস্থিতবুদ্ধি ছিল রামমোহনের—সব অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে পারতেন।

অদ্ভুত মেধাশক্তি ছিল রামমোহনের। একদিন এক পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইলেন তাঁর সঙ্গে, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রটা ভাল ক'রে পড়া ছিল না রামমোহনের। তাই তিনি পণ্ডিতমশাইকে বললেন যে আলোচনাটা পরদিন ক'রলেই তাঁর পক্ষে সুবিধে হয়। রাজী হলেন পণ্ডিত। পরের দিন আবার ঐ সময়ে আসবেন ব'লে চ'লে গেলেন। এর মধ্যে রামমোহন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে লোক পাঠালেন। সেখান থেকে আনিয়ে নিলেন প্রয়োজনীয় সব বই।

আনিয়ে প'ড়ে ফেললেন সব। পরের দিন যখন পণ্ডিত এলেন তখন তিনি আর এঁটে উঠতে পারলেন না রামমোহনের সঙ্গে। তর্কে হেরে গেলেন তিনি।

আর একদিন নিজের বৈঠকখানায় ব'সে আছেন রামমোহন। চিন্তা করছেন একটি গভীর বিষয় নিয়ে। হঠাৎ একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। কি ব্যাপার? কি হ'য়েছে তোমার? কিছুই বলে না মেয়েটি, শুধু কাঁদে। মুখ তুলে দেখেন পেছনেই দাঁড়িয়ে তাঁর অনুগত শিষ্য নন্দকিশোর বসু। কি ব্যাপার নন্দ? জিজ্ঞেস করলেন রামমোহন। নন্দও বলে না কিছু, খালি আম্‌তা আম্‌তা করে। আরে, কি হয়েছে খুলে বলো না সব, ধমক্ মারলেন রামমোহন। তখন নন্দ যা' বলল তা' থেকে রামমোহন বুঝলেন যে এই মেয়েটি নন্দকিশোরের স্ত্রী। বাবা-মা বিয়ের আগে অন্য একটি ফরসা মেয়ে দেখিয়েছিলেন পাত্রপক্ষকে। তারপর বিয়ের সময়ে দেখা গেল যে তাঁরা জোচ্চুরি ক'রেছেন, ফরসা মেয়ে দেখিয়ে গছিয়ে দিয়েছেন এই কালো মেয়ে। কাজেই এখন এ মেয়েটিকে গ্রহণ করবে না ঠিক ক'রেছে নন্দকিশোর। রামমোহন অনেক বোঝালেন শিষ্যকে। বললেন, ছ্যাখো, শুধু বাইরের সৌন্দর্য্য দেখলেই কি চলে? যে গাছ ভাল ফল প্রসব করে সেই গাছকেই না আমরা ভাল গাছ বলি? সেইরকম তোমার স্ত্রী সুন্দরী না অসুন্দরী, সে কালো কি ফর্সা, তা' দিয়ে ত' কিছু আসে যায় না। এ কি রকম সন্তান প্রসব করে তাই দিয়েই এর বিচার করতে হবে। হয় ত' দেখবে এই কালো মেয়ের গর্ভেই তোমার এমন ছেলে হবে যে তোমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এইভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নন্দকিশোরকে ঠাণ্ডা করলেন রামমোহন। স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল নন্দ। রামমোহনের ভবিষ্যদ্‌বাণীও বিফল হয় নি। নন্দকিশোরের এই কালো স্ত্রীর গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু।

সতীদাহ প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্যে রামমোহন যখন মেতে উঠেছেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধদলী তাঁকে মারধোর করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। একদিন এক ভক্ত এসে রামমোহনকে জানালেন সে-কথা। বললেন, একটু সাবধান হ'য়ে চলাফেরা করাই ভাল। কি দরকার যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাবার? দুষ্টু লোক ওরা, মারধোর ক'রলে আপনি ক'রছেন কি?

হেসে উঠলেন রামমোহন। বললেন, মারবে? কে মারবে আমায়? কলকাতার লোকেরা? কি খায় তারা? গায়ে তা'দের কত জোর? মনে সাহস কতখানি?

সত্যি সত্যি হাসবার অধিকার ছিল রামমোহনের। সুগঠিত, বলিষ্ঠ দেহ। গায়েও তেমনি হাতির মত বল। মনে সাহসও অপরিসীম। তাঁর খাওয়াও ছিল অসাধারণ। রোজ সের বারো দুধ তাঁর চাই-ই। মাংস খেতে হয় ত' একটা আস্ত পাঁঠাই খেয়ে ফেলতেন তিনি। জল-যোগ করব তা' নিদেনপক্ষে গোটা পঞ্চাশেক আম, আর এটা ওটা একটু আধটু—এই না হ'ল ত' হ'ল কি? ডাব খাওয়াবে? কি, ভদ্রতা ক'রে একটি ডাবের মুখ ছুলে নিয়ে এসেছো? উঁহু, ওতে হবে না। আমার বাপু চক্ষু লজ্জা-টজ্জা নেই একটুও। ভদ্রতার বড়াই নেই এতটুকু। নিয়ে এসো অন্ততঃ একটা কাঁদি ডাব। খেয়ে একটু শরীরটা ঠাণ্ডা করি।

রামমোহনের বিচার-বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তাই অনেকেই তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসতেন বৈষয়িক ব্যাপারে। একদিন টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ মুন্সীর কাছে একজন লোক একটি শঙ্খ বিক্রী করতে নিয়ে এল। এসে বলল যে এ শঙ্খের ভয়ানক গুণ। এ যা'র কাছে থাকে, তার কিছুরই অভাব থাকে না, তা'র বাড়ীতে কমলা অচলা হ'য়ে অবস্থান করেন। এই শঙ্খের এমন আশ্চর্য্য গুণ

শুনে কালীনাথ বাবু ত' এ কিনবেন ঠিক ক'রে ফেললেন। দামও ঠিক হ'ল পাঁচ শ' টাকা। কিন্তু কেনবার আগে রামমোহনকে একবার বলা দরকার। তাই শঙ্খবিক্রেতাকে নিয়ে রামমোহনের বাড়ীতে এলেন কালীনাথ। আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে আদ্যোপান্ত সব বললেন তাঁকে। জিজ্ঞেস করলেন তাঁর মত। সব শুনে রামমোহন বললেন, দ্যাখো, সমস্ত জগৎ যার জন্যে হাহাকার করছে, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতার অভীষ্ট দেবী, সেই কমলাকে যদি পাঁচ শ' টাকার বিনিময়ে বরাবরের জন্যে বাড়ীতে বেঁধে রাখতে পার, তবে তা'র চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে ? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। মাত্র পাঁচ শ' টাকা পেয়েই এমন অমূল্য রত্ন হাতছাড়া করতে চাইছে কেন এই লোকটি ? তবে কি অচলা লক্ষ্মীর তুলনায় পাঁচ শ' টাকাই বড় হ'ল ? এই কথায় চৈতন্য উদয় হ'ল কালীনাথের। তিনি আর কিনলেন না সেই শঙ্খ।

রাজপ্রাসাদ ও পর্ণ-কুটীর সমান জ্ঞান করতেন রামমোহন। ধনী-দরিদ্রের ভেদ তাঁর কাছে ছিল না। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর। সেই সময়ে রামমোহনের অন্য একটি গরীব বন্ধুও হাজির হন সেখানে। দু'জনকেই সমানভাবে অভ্যর্থনা করলেন রামমোহন। দু'জনের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করলেন।

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে রামমোহন খুব শ্রদ্ধা করতেন। তীর্থস্বামী তখন থাকেন কাশীধামে। রামমোহনের খুব ইচ্ছে যে স্বামীজী কিছু-দিন ক'লকাতায় এসে থাকেন। অনেক চিঠি লিখলেন রামমোহন। কিন্তু কিছুতেই রাজী করাতে পারলেন না স্বামীজীকে। তখন একটা ফন্দি আঁটলেন রামমোহন। স্বামীজীর ভাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁর খুব অনুগত। তাঁকে দিয়ে একটি মোকদ্দমা রুজু করিয়ে দিলেন রাম-

মোহন। কোর্টের সমন পেয়ে এবার ত' আসতেই হবে স্বামীজীকে। সমন পেয়ে তীর্থস্বামী কলকাতায় এলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এ কার কারসাজি। রেগে গেলেন খুব। ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে এক প্রকাণ্ড থান ইঁট হাতে নিয়ে রামমোহনের মাণিকতলার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লেন। চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলেন রামমোহনকে—বেড়িয়ে আয় তুই, আজ তোকে মেরেই ফেলব। অনর্থক চালাকি ক'রে আমায় হয়রান করলি! বেরিয়ে এলেন রামমোহন। এসেই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলেন তীর্থস্বামীকে। স্বীকার করলেন নিজের অপরাধ। বললেন, তাঁর সঙ্গলাভ করবার অদম্য ইচ্ছে হয়েছিল মনে। তাই এই কারচুপিটুকু করেছেন। ক্রমশঃ শান্ত হলেন স্বামীজী। রামমোহনের অনুরোধে কিছুদিন তাঁর বাড়ীতে কাটিয়ে গেলেন।

॥ পঁচিশ ॥

অনেকদিন থেকেই রামমোহনের একান্ত ইচ্ছে ছিল* যে তিনি বিলেত যাবেন। কিন্তু বেশ সুবিধে ক'রে উঠতে পারছিলেন না। ক্রমে অবস্থা অনুকূল হ'য়ে আসতে লাগল। তিনি প্রস্তুত হ'তে লাগলেন বিলাত যাবার জন্যে। এ খবর রটতেও বেশী সময় লাগল না। দেশময় চারদিকে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। হিন্দুর ছেলে হ'য়ে শেষকালে যাবে ঐ ম্লেচ্ছদের দেশে ? যা'দের ছায়া পড়লে আমাদের খাওয়া নষ্ট হয়, শেষকালে তা'দেরই হাতের জল খাবে ? কেন, এতখানি বাড়াবাড়ি কি না করলেই নয় ? তোমার পূর্ব্বপুরুষরা যে কখনও সাগর পার হয় নি, তা'ই ব'লে কি মানুষ হয় নি তা'রা ? আর তুমিই একবার ওখানে গিয়ে মস্ত একটা কেউকেটা হ'য়ে আসবে !

কিন্তু সে-সব কথায় কান দিলেন না রামমোহন। তাঁকে বিলাত যেতেই হবে। সেখানে তাঁর অনেক কাজ। প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতুন সনদ দেবার সময় হ'য়ে এসেছে। এই সনদ দেবার সময়ে ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ব্যবস্থা এবং ভারতবাসীদের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের সম্পর্ক স্থির করা হবে। আর এই সময়ে যে ব্যবস্থা ঠিক্ করা হ'বে, তা' চলবে অনেকদিন। তাই সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। তা' ছাড়া সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছে ধর্ম্মসভা। তা'র শুনানী আরম্ভ হ'বার আগেই ত' পৌঁছানো চাই সেখানে !

যোগাযোগও হ'ল অদ্ভুত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবরকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করেছিল। দিল্লীর সম্রাট এ-বিষয়ে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদের কাছে আবেদন করতে চাইলেন। কিন্তু চিঠিপত্রে এ সব কাজ হয় না। গিয়ে, তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে মুখে বলতে হয় সব কথা। কিন্তু সম্রাটের তরফে যায়ই বা কে ? কে আছে এমন যোগ্য লোক, যে গিয়ে কাজ হাসিল ক'রে

আসতে পারে ? সম্রাট বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়ল রামমোহনের নাম। এই সেই নির্ভীক, বিচক্ষণ লোক যা'র ওপরে এ-কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। ১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসে দিল্লীর বাদশাহ্ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিলেন এবং ইংলণ্ডের রাজসভায় পাঠাবার জন্যে তাঁকে দূত-পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কোম্পানী এর কোনোটাই মানল না। তা'রা রামমোহনের 'রাজা' উপাধি স্বীকার করল না, স্বীকার করল না তাঁকে সম্রাটের দূত ব'লে। রামমোহন এ সব গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি তৈরী হ'তে লাগলেন তাঁর যাত্রার জন্য।

১৮৩০ সালে ১৫ই নভেম্বর তারিখে রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এবং রামহরি দাসকে সঙ্গে নিয়ে "আলবিয়ান" নামে জাহাজে আরোহণ করলেন রামমোহন। এই রাজারাম ছিলেন রামমোহনের পালিত পুত্র। হরিদ্বারের মেলায় ছোটবেলায় একে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সিভিলিয়ান ডিক্ সাহেব। কিছুদিন তাকে মানুষও করেছিলেন তিনি, কিন্তু মুস্কিল হ'ল তাঁর বিলেত যাবার সময়ে। কার হাতে তুলে দেবেন এই হতভাগ্য শিশুকে ? রামমোহন গ্রহণ করলেন এই অনাথ শিশুকে মানুষ করবার ভার। অনেকে এ জন্য নিন্দে করত রামমোহনের। বলত, একটা মুসলমানের ছেলেকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন ? নিজের ছেলের চেয়ে বেশী আদর এই ম্লেচ্ছ ছোঁড়ার ? রামমোহন তাদের বোঝাতে পারলেন না যে শিশুর কোনো জাত নেই, সে সব জাতের ঊর্দ্ধে। যাই হোক, তাকে মানুষ করে তুললেন রামমোহন। বিলেত যাবার সময়েও সঙ্গে রইল সে। জাহাজে পাছে দুধের কষ্ট হয়, তাই দু'টি গরুও সঙ্গে নিলেন।

জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলতে আরম্ভ করল। একটু পরেই সকলে সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হ'লেন। কিন্তু রামমোহনের কিছু হ'ল না। বেশ সুস্থ শরীরে, প্রফুল্ল মনে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। মহাসমুদ্রের

ধীর গম্ভীর ভাব তাঁর মনে এক অপূর্ব ভাব এনে দিত। সাগরের বুকে যখন ঝড় উঠতো তখন রামমোহন নিশ্চিন্ত মনে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখতেন। চারিদিকে জল, শুধু জল, তবু চিত্ত তাঁর বিকল হ'ল না। এও ত' এক নতুন অভিজ্ঞতা, এও ত' আর এক জীবন যা'র সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত জীবনের বড় একটা মিল নেই। মাঝে মাঝে শুধু মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ভয় হয় কোম্পানীর সনদ বুঝি বা নেওয়া হ'য়ে গেল, তিনি বুঝি গিয়ে পড়তে পারলেন না।

জাহাজে ক'রে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন একখানি ফরাসী জাহাজের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হ'ল নেটাল বন্দরে। তিনি খুব ব্যগ্র হ'য়ে পড়লেন ঐ জাহাজে যাবার জন্য। তা'র ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হ'ল। জাহাজের ফরাসীরা তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করলেন। স্বাধীন ফরাসী দেশের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে তিনি যে কত আনন্দলাভ ক'রেছেন, গৌরবিত হ'য়েছেন কতখানি, তা' দোভাষী মারফত রামমোহন ফরাসী-দের জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে তাঁর সবচেয়ে আনন্দ এই দেখে যে পার্থিব শক্তির ওপর ন্যায়ের জয় প্রকাশ পেয়েছে। ফরাসীদেশের গৌরবধ্বনি করতে করতে রামমোহন নিজের জাহাজে ফিরে এলেন।

লিভারপুলে পৌঁছলেন রামমোহন। কোথায় থাকবেন তা'র ঠিক হয় নি কিছু। উইলিয়াম র‍্যাথ্‌বোন্‌ সাহেব তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন যা'তে তাঁর "গ্রীনব্যাঙ্ক" ভবনে রামমোহন ওঠেন। কিন্তু অন্য কারুর বাড়ীতে থাকা রামমোহনের পছন্দ হ'ল না। তা'তে নিজের স্বাধীন সত্তা থাকে না, সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে দিন কাটে না। তাই র‍্যাথ্‌বোন্‌ সাহেবের সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন রামমোহন; কিন্তু তা'র সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ ক'রতে পারলেন না ব'লে অত্যন্ত দুঃখিত। "র‍্যাড্‌লিস্‌" হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করলেন রামমোহন।

লিভারপুলে সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত ও ইতিহাস লেখক উই-

লিয়াম রস্কোর সঙ্গে রামমোহনের আলাপ হ'ল। এর আগেই রামমোহনের প্রশংসা শুনে ও বই প'ড়ে তিনি তাঁর লেখা বই ও চিঠি ভারতবর্ষের ঠিকানায় পাঠান। কিন্তু তা'র আগেই রামমোহন বিলাত-যাত্রা করেছেন, কাজেই সে-সব আর তাঁর হাতে পৌঁছায়নি। রামমোহন যখন লিভারপুলে এলেন রস্কো তখন পক্ষাঘাত রোগে শয্যা-শায়ী। তবু রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করলেন তিনি, অনুরোধ জানালেন তাঁর বাড়ীতে আসবার জন্যে। এ আহ্বান যে অন্তরের আহ্বান! সাড়া না দিয়ে কি উপায় আছে? রস্কোর বাড়ীতে এলেন রামমোহন। দুই মনীষীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ল। রস্কো বললেন, "আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি' যে আজকের দিন পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি।" রামমোহনও তাঁকে জানালেন যে এ-আলাপে তিনি কত খুসী, কত আহ্লাদিত।

অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল এখানে। অনেকে আলাপ করতে আসত তাঁর সঙ্গে। এই সব নিয়ে খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই দিন কাটছিল। কিন্তু আর ত' এখানে থাকা চলে না। এবার লণ্ডন যেতে হবে। শুনতে হবে সেখানে রিফর্‌ম্ বিল ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি রকম তর্ক-বিতর্ক হয়। যাবার সময়ে রস্কো তাঁর বন্ধু লর্ড ব্রুহাম্‌কে একখানা চিঠি দিয়ে দিলেন। তা'তে অনুরোধ জানালেন রামমোহনকে যেন পার্লামেণ্টে গ্যালারীর নীচেই আসন দেওয়া হয়।

লণ্ডন আসার পথে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলকারখানা দেখবার জন্য নামলেন রামমোহন। সেখানে র'টে গেল "ভারতের রাজা" এসেছে। ওরে কে দেখবি দেখে আয়। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে—সব ছুটে এল দলে দলে রাজাকে দেখতে। আরে থাক্ তোর কাজকম্ম মাথায়, আগে চ' রাজাকে দেখে আসি। যা'রা তাঁকে দেখতে এলো তা'দের প্রত্যেকের সঙ্গেই অত্যন্ত অমায়িকতার সঙ্গে করমর্দন করলেন রামমোহন। মিষ্টি কথায় তাদের কুশল প্রশ্ন করলেন। আহ্লাদে অভিভূত হ'য়ে পড়ল তা'রা। চারদিকে প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল। ওরে, এই না হ'লে কি রাজা?

॥ ছাব্বিশ ॥

রাতের অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন। লণ্ডনে এসে পৌঁছালেন রাম-মোহন। গিয়ে উঠলেন 'আডেলফি' হোটেলে। তখনও অন্ধকার কাটে নি, উষার কিরণ এসে জানায় নি অরুণদেবের আগমনবার্তা। ঘুমুচ্ছেন রামমোহন, এমন সময়ে হোটেলে এসে হাজির হ'লেন জেরেমি বেন্থাম্। আধুনিক ব্যবস্থা দর্শনের সৃষ্টিকর্তা বেন্থাম্। সকলে অবাক হ'য়ে গেল। আরে এ কী? যে লোক আজ কত বছর হ'ল নিজের বাড়ী ছেড়ে কোথাও যায় নি, বেড়াতে হ'লে যার একমাত্র বেড়াবার জায়গা ছিল নিজের বাগান, সে কি না এই নিশীথকালে হোটেলে এসে উপস্থিত! কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেন বেন্থাম রামমোহন কোথায়। তা'রা জানালো যে তিনি তখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। একটু কাগজে লিখে রেখে গেলেন বেন্থাম। লিখলেন, "জেরেমি বেন্থাম, তাঁর বন্ধু রামমোহন রায়ের কাছে এসেছিলেন।"

ইউরোপীয় মনীষীদের সঙ্গে ত' আলাপ হ'ল। কিন্তু কাজের চাপ পড়ায় বেশী পরিশ্রমে অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন তিনি। ডাক্তারসাহেব বারণ করে দিলেন ভৃত্যদের, যেই আসুক কাউকে যেন দেখা করতে না দেওয়া হয় রামমোহনের সঙ্গে।

ভারতবর্ষ থেকে যখন রামমোহন যান তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বীকার করে নি তাঁর 'রাজা' উপাধি। স্বীকার করেনি তাঁর দিল্লীশ্বরের দৌত্য। কিন্তু ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট এসব স্বীকার করে নিলেন। পরম সমাদরেই ইংলণ্ড তাঁকে গ্রহণ করল। তাঁর রচনা, তাঁর কর্মশক্তি এবং তাঁর মনীষার খবর এর মধ্যেই ইউরোপে আলোড়ন এনেছিল। ইংলণ্ডাধিপতির রাজ্যাভিষেকের সময়ে অন্য অন্য দূতদের সঙ্গে রাম-মোহনের আসন দেওয়া হ'ল। কোম্পানীর বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার হব্হাউজ তাঁর রাজোপাধি ও দৌত্য স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রামমোহনকে সম্মান জানাবার জন্য এক ভোজ-সভার ব্যবস্থা করলেন। রামমোহন সে সভায় হাজির হ'লেন। খেলেন শুধু ভাত আর ঠাণ্ডা জল।

লণ্ডনে বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের ভাইবোনেরা থাকতেন। কলকাতা থেকে হেয়ার চিঠি লিখে দিয়েছিলেন তাঁদের রামমোহনের সুবিধা-অসুবিধা দেখবার জন্যে। তাঁরা এসে রামমোহনকে অনুরোধ জানালেন তাঁদের পরিবারের সঙ্গে থাকবার জন্য। কিন্তু সে প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন না রামমোহন।

১৮৩২ সালের শরৎকালে তিনি ফরাসী দেশে যাবার জন্যে যাত্রা করলেন। মহাসাগরের বুকে একদিন যে-দেশের জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে তা'দের পতাকাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, আজ সুযোগ এসেছে সেই দেশের মাটিতে পা দেবার। তাঁর সুখ-সুবিধা দেখবার জন্যে সঙ্গে গেলেন হেয়ার সাহেবের ভাই।

ফরাসী দেশে খুব সমাদর পেলেন রামমোহন। সম্রাট লুই ফিলিপ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন। ফরাসী সম্রাট একদিন রামমোহনকে নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে খেলেনও। এমন বড় একটা হয় না। এতখানি সম্মান ফরাসী সম্রাট বড় একটা কাউকে দেন না। রামমোহন সম্রাটের সঙ্গে অন্য কিছু খেলেন না। শুধু ফলমূল খেলেন।

আর একদিন প্যারিসে এক হোটেলে খাবার সময়ে আলাপ হ'য়ে গেল সুপ্রসিদ্ধ স্যার টমাস্ মুরের সঙ্গে। একসঙ্গে তাঁরা আহার করলেন, আলোচনা করলেন কত গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে। রামমোহনের মধুর ব্যবহার এবং উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন স্যার টমাস। এ কথা লিখে রেখে দিলেন তাঁর ডায়েরীতে।

১৮৩৩ সালের প্রথমদিকে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন রামমোহন। এবার উঠলেন ডেভিড হেয়ারের ভাইদের বাড়ীতে। কিন্তু বেশীদিন এখানে

থাকা হ'ল না। তাঁর মত বিচক্ষণ লোকও কয়েকজনের কুপরামর্শে ভুলে গেলেন। তাঁকে বোঝালো তারা যে লোকের কাছে সম্মান পেতে গেলে তাঁকে রাজার মতই থাকতে হবে। থাকতে হবে সেইরকম জাঁকজমকে। রিজেন্ট পার্কে 'কম্বারল্যাণ্ড টেরাস' নামে একটি প্রাসাদতুল্য সুন্দর বাড়ী ভাড়া নিলেন রামমোহন। রাজার হালেই থাকবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু খরচ কুলিয়ে উঠতে পারলেন না বেশীদিন। সেই বিদেশেও তাঁর দেশ তাঁকে বঞ্চনা করল। দেশ থেকে প্রতিশ্রুতি মত অর্থ সাহায্য তিনি পেলেন না—দিল্লীর বাদশাহ্ পাঠালেন না তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। অল্পদিনের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরে এলেন তিনি হেয়ার পরিবারে।

লণ্ডনে থাকার সময়ে সেখানকার নাট্যশালায় মাঝে মাঝে অভিনয় দেখতে যেতেন রামমোহন। কোনো কোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপও হ'য়েছিল। এ-বিষয়ে কোনো কুসংস্কার ছিল না তাঁর। হাস্যালাপে মুগ্ধ হ'য়ে যেতো যে ই আসতো তাঁর সংস্পর্শে। একদিন ইসাবেলা নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে ত' কেঁদেই আকুল রামমোহন। অভিনয় এত সুন্দর হ'য়েছিল যে সে করুণ দৃশ্য রামমোহনের কোমল প্রাণের তারে আঘাত দিয়েছিল। মাঝে মাঝে নাচ দেখতেও যেতেন তিনি।

॥ সাতাশ ॥

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রামমোহন ব্রিস্টল নগরের কাছে 'স্টেপল্‌টন গ্রোভ্' নামে একটি মনোরম ভবনে এসে উঠলেন। সঙ্গে এলেন ডেভিড হেয়ারের বোন মিস হেয়ার। এ জায়গাটি তাঁর ভাল লাগল। এখানে এসে তৃপ্তিলাভ করলেন তিনি। লণ্ডনে বড় গোল-মাল, সব সময়েই যেন সবাই ব্যস্ত। এখানে বেশ একটা শান্ত, সমাহিত ভাব। ব্রিস্টলে অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'ল রামমোহনের। দেখা করতে এলেন সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক রেভারেণ্ড জন্ ফস্টর, এলেন কুমারী কার্পেণ্টার ও আরও অনেকে।

এগারোই সেপ্টেম্বর তারিখে, 'স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভ' ভবনে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি এলেন। তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা করলেন রামমোহন। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন রাজার পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতায়। চারিদিকে প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল।

উনিশে সেপ্টেম্বর রাজা জ্বরাক্রান্ত হ'লেন। ক্রমশঃ জ্বর বাড়তে লাগল। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিকারও দেখা দিল। বড় বড় ডাক্তাররা এলেন। সকলে পরামর্শ ক'রে চিকিৎসা চালাতে লাগলেন। রাতের পর রাত জেগে মিস হেয়ার সেবা করতে লাগলেন রুগীর। এতটুকু ক্লান্তি নেই, নেই এতটুকু অবসাদ। সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। বাঁচিয়ে তুলতেই হবে রাজাকে। কিন্তু বড় একটা সুবিধে হ'ল না। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন রামমোহন। মাঝে মাঝে উচ্চারণ করেন প্রণব ধ্বনি। এইভাবে আট দিন কেটে যাবার পর সাতাশে সেপ্টেম্বর রাত দু'টো পঁচিশ মিনিটের সময়ে পৃথিবীর কাছে চিরবিদায় নিয়ে চোখ বুজলেন রামমোহন।

নিজের মৃত্যুর পর কিভাবে তাঁর সৎকার করা হবে, সে-কথা তিনি বন্ধুদের বলে রেখেছিলেন আগে থেকেই। ইংরেজ বন্ধুদের তিনি

অনুরোধ করেছিলেন, তাঁকে যেন খৃস্টানদের সমাধিস্থানে খৃস্টানমতে সমাধিস্থ করা না হয়। অন্য কোনো জায়গায় যেন তাঁর শরীর প্রোথিত করা হয়। তা' না হ'লে তাঁর ছেলেরা তাঁর সম্পত্তির অধিকার থেকে হয়ত' বঞ্চিত হবে! হয় ত' দুষ্ট লোকেরা মামলা মোকদ্দমা ক'রে তা'দের বিপদে ফেলবে। সত্যি সত্যি, আইনের চোখে নিজের জাত বজায় রাখবার জন্যে তিনি সব সময়েই সতর্ক থাকতেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তিনি যজ্ঞোপবীত ঠিক রেখে এসেছেন। কাজেই তাঁর ইচ্ছামত ১৮ই অক্টোবর স্টেপ্‌লটন গ্রোভের কাছে একটি নির্জন জায়গায় নিঃশব্দে তাঁর দেহ সমাহিত করা হ'ল। এইভাবেই অবসান হ'ল এই মহামানবের জীবনের। কিছুদিন পরে রাজার বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেত যান, তখন তিনি এইখান থেকে রামমোহনের সমাধিস্থ দেহের অবশিষ্টাংশ 'আর্‌নোস্‌ ভেল্‌' নামে একটি জায়গায় নিয়ে আসেন এবং তার ওপরে একটি মনোরম সমাধি মন্দির তৈয়ারী করিয়ে দেন। আজও আছে সে মন্দির। আজও সেই মন্দিরের ওপরকার লেখা ঘোষণা করে রামমোহনের মহিমা, প্রচার করে সেই বিরাট পুরুষের মহাপ্রাণতা।

এই মহাপুরুষের তিরোভাবে বাংলার কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত ক'রে এই পুণ্য চরিত-কথা শেষ করলুম—

জয় রাজা রামমোহন, হে বরেণ্য ব্রাহ্মণ প্রবর,
জানায়েছ বার্তা তার মর্ত্যে যাহা করে গো অমর।
মরু-তলে মায়া-জলে, হে পিয়াসী, জন্মেনি বিভ্রম,
প্রতিভার অগ্রগতি বিপত্তি ক'রেছে অতিক্রম।
সে-দীক্ষা দাও নি, যাহা মানুষেরে করে ক্রীতদাস,
উদয়-হোরায় তব পূর্বাশায় আলোর উল্লাস।

তরুণ বয়সে তোমা' ডেকেছিল বৃদ্ধ-হিমালয়,
ঝঞ্ঝা যেথা লোষ্ট্র হানে, ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রে পশিলে নির্ভয়।
অমোঘ তোমার বাণী, চমকিয়া মগ্ন-চেতনায়
মদমত্ত করি-কুম্ভে ভাসায়েছে আষাঢ়-ধারায়।
এই কর্মভূমি মাঝে যশোভাতি করিয়া অর্জন
শুভ তব শেষ যাত্রা, লভিয়াছ নিত্য-নিকেতন
কঠোর তপস্যা করি' মিশিয়াছ ঋত্বিক্ সমাজে,
উদ্‌ঘোষিত নাম তব, কাল-শৈলে স্মৃতি-ডঙ্কা বাজে।

আকাশের সম সূক্ষ্ম, অগ্নি যাবে পাবে না পোড়াতে,
অখণ্ডিত রহে যাহা পুনঃ পুনঃ খড়্গের আঘাতে,
সম্পদে মোহিত হ'য়ে সে চিন্ময়ী হওনি বিস্মৃত,
ধ্যেযাইলে অদ্বিতীয়ে, ব্রহ্মসূত্রে কণ্ঠ অলঙ্কৃত।
মানুষী মুরতি ধরি' বিশালাক্ষী শ্রুতি-সরস্বতী
নিমেষের দৃষ্টিপাতে দেখেছেন তোমার আরতি।

প্রবেশিয়া জ্ঞানময় অন্তরের প্রমাণ-মন্দিরে
শুনেছ প্রণব-স্পন্দ ; চতুর্ধাম ভারতের তীরে
যুগে যুগে কল্পান্তরে, ভেসে আসে যে লীলা-কমল,
যার মধুবিন্দু লাগি' বিশ্বপ্রাণ পিয়াসে পাগল, --
অনন্য ভকতিভরে রূপ থেকে চিনেছ অরূপ,
উত্তমন্ত্র বর লভি' আস্বাদিছ আনন্দ অনুপ ;

জগৎ তরঙ্গ ছোটে যে পরম পদের উদ্দেশে,
যে পদ ব্যথিত নহে প্রলয়ের মহানৃত্য শেষে।
অন্তরীক্ষে ওই নীল তিরস্করণীর পরপার
যেথা তুমি আছ সেথা পাঠাইনু প্রণাম আমার।

শেষ

বাংলার সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য একদিন যে মনীষীর চিন্তাধারায় নব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল, সেই রাজা রামমোহন রায়ের কীর্তি ও সাধনার কাহিনী বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে আছে। এই মহাপুরুষের জীবনের চিত্তাকর্ষক তথ্যগুলির সংগ্রহে গ্রন্থকার তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। একজন সর্ববরেণ্য সমাজ-সংস্কারক হিসেবেই রামমোহনের প্রসিদ্ধি জন-সমাজে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এই গ্রন্থখানিতে তাঁর জীবনের উপর এমন এক নূতন আলোকসম্পাত করা হয়েছে যা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, রামমোহন শুধু সমাজ-সংস্কারকই ছিলেন না—তিনি ছিলেন স্বাধীনতার অগ্রদূত। তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর দেশপ্রেম সে-যুগের এক অনন্যসাধারণ ব্যাপার ব'লেই স্বীকৃতি লাভ করবে। গ্রন্থখানির লিপিকুশলতা সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার চিত্তবিনোদন করতে সমর্থ হবে।